একাদশ সংখ্যা]　　ফাল্গুন ১৩২১　　[প্রথম বর্ষ

সবুজ পত্র

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সবুজ পত্র

শ্রীবিলাস

এখানে এক সময়ে নীলকুঠি ছিল। তার সমস্ত ভাঙিয়া চুরিয়া গেছে, কেবল গুটিকতক ঘর বাকি। দামিনীর মৃত দেহ দাহ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় এই জায়গাটা আমার পছন্দ হইল তাই কিছুদিনের জন্য এখানে রহিয়া গেলাম।

নদী হইতে কুঠি পর্য্যন্ত যে রাস্তা ছিল তার দুইধারে সিসু গাছের সারি। বাগানে ঢুকিবার ভাঙা গেটের দুটা থাম আর পাঁচিলের এক দিকের খানিকটা আছে কিন্তু বাগান নাই। থাকিবার মধ্যে এক কোণে কুঠির কোন্ এক মুসলমান গোমস্তার গোর; তার কাটলে কাটলে ঘন ঝোপ করিয়া ভাঁটিফুলের এবং আকন্দের গাছ উঠিয়াছে, একেবারে ফুলে ভরা;—বাসর ঘরে শ্যালীর মত মৃত্যুর কান মলিয়া দিয়া দক্ষিণা বাতাসে তারা হাসিয়া লুটোপুটি করিতেছে।

দীঘির পাড় ভাঙিয়া জল শুকাইয়া গেছে; তার তলায় ধনে'র সঙ্গে মিলাইয়া চাষীরা ছোলার চাষ করিয়াছে; আমি যখন সকালবেলায় সেৎলা-পড়া ইঁটের ঢিবিটার উপরে সিঙ্গুর ছায়ায় বসিয়া থাকি তখন ধনে' ফুলের গন্ধে আমার মগজ ভরিয়া যায়।

বসিয়া বসিয়া ভাবি, এই নীলকুঠি, যেটা আজ গো-ভাগাড়ে গোরুর হাড় ক'খানার মত পড়িয়া আছে সে যে একদিন সজীব ছিল। সে আপনার চারিদিকে সুখদুঃখের যে ঢেউ তুলিয়াছিল মনে হইয়াছিল সে তুফান কোনোকালে শান্ত হইবে না। যে প্রচণ্ড সাহেবটা এইখানে বসিয়া হাজার হাজার গরীব চাষার রক্তকে নীল করিয়া তুলিয়াছিল, তার কাছে আমি সামান্য বাঙ'লীর ছেলে কেই বা! কিন্তু পৃথিবী কোমরে আপন সবুজ আঁচলখানি আঁটিয়া বাঁধিয়া অনায়াসে তাকে-সুদ্ধ তার নীলকুঠি-সুদ্ধ সমস্ত বেশ করিয়া মাটি দিয়া নিছিয়া পুঁছিয়া নিকাইয়া দিয়াছে,—যা একটু আধটু সাবেক দাগ দেখা যায় আরো এক পোঁচ লেপ পড়িলেই একেবারে সাফ হইয়া যাইবে।

কথাটা পুরানো, আমি তার পুনরুক্তি করিতে বসি নাই। আমার মন বলিতেছে, না গো, প্রভাতের পর প্রভাতে এ কেবল মাত্র কালের উঠান-নিকানো নয়। সেই নীলকুঠির সাহেবটা আর তার নীলকুঠির বিভীষিকা একটুখানি ধূলার চিহ্নের মত মুছিয়া গেছে বটে—কিন্তু আমার দামিনী!

আমি জানি আমার কথা কেহ মানিবে না। শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গর কাহাকেও রেহাই করে না। মায়ামযমিদমখিলং ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য ছিলেন সন্ন্যাসী—কা তব কান্তা, কস্তে

পুত্রঃ—এ সব কথা তিনি বলিয়াছিলেন কিন্তু এর মানে বুঝেন নাই। আমি সন্ন্যাসী নই তাই আমি বেশ করিয়া জানি দামিনী পদ্মের পাতায় শিশিরের ফোঁটা নয়।

কিন্তু শুনিতে পাই গৃহীরাও এমন বৈরাগ্যের কথা বলে। তা হইবে। তারা কেবলমাত্র গৃহী—তারা হারায় তাদের গৃহিণীকে। তাদের গৃহও মায়া বটে, তাদের গৃহিণীও তাই। ও-সব যে হাতে-গড়া জিনিষ, ঝাঁট পড়িলেই পরিষ্কার হইয়া যায়।

আমি ত' গৃহী হইবার সময় পাইলাম না; আর, সন্ন্যাসী হওয়া আমার ধাতে নাই, সেই আমার রক্ষা। তাই আমি যাকে কাছে পাইলাম সে গৃহিণী হইল না, সে মায়া হইল না, সে সত্য রহিল, সে শেষ পর্য্যন্ত দামিনী। কার সাধ্য তাকে ছায়া বলে!

দামিনীকে যদি আমি কেবলমাত্র ঘরের গৃহিণী করিয়াই জানিতাম তবে অনেক কথা লিখিতাম না। তাকে আমি সেই সম্বন্ধের চেয়ে বড় করিয়া এবং সত্য করিয়া জানিয়াছি বলিয়াই সব কথা খোলসা করিয়া লিখিতে পারিলাম, লোকে যা বলে বলুক।

মায়ার সংসারে মানুষ যেমন করিয়া দিন কাটায় তেমনি করিয়া দামিনীকে লইয়া যদি আমি পূরামাত্রায় ঘরকন্না করিতে পারিতাম তবে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আহারান্তে পান চিবাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম, তবে দামিনীর মৃত্যুর পরে নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিতাম, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ, এবং সংসারের বৈচিত্র্য আবার একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য কোনো একজন পিসি বা মাসির অনুরোধ শিরোধার্য্য করিয়া লইতাম। কিন্তু পুরাতন জুতা-জোড়াটার মধ্যে পা যেমন চোকে তেমন অতি সহজে আমি

আমার সংসারের মধ্যে প্রবেশ করি নাই। গোড়া হইতেই সুখের প্রত্যাশা ছাড়িয়াছিলাম। না, সে কথা ঠিক নয়—সুখের প্রত্যাশা ছাড়িব এত বড় অমানুষ আমি নই। সুখ নিশ্চয়ই আশা করিতাম কিন্তু সুখ দাবি করিবার অধিকার আমি রাখি নাই।

কেন রাখি নাই? তার কারণ, আমিই দামিনীকে বিবাহ করিতে রাজি করাইয়াছিলাম। কোনো রাঙা চেলির ঘোমটার নীচে সাহানা রাগিণীর তানে ত আমাদের শুভদৃষ্টি হয় নাই। দিনের আলোতে সব দেখিয়া শুনিয়া জানিয়া বুঝিয়াই এ কাজ করিয়াছি।

লীলানন্দ স্বামীকে ছাড়িয়া যখন চলিয়া আসিলাম তখন চাল-চুলার কথা ভাবিবার সময় আসিল। এতদিন যেখানে যাই খুব ঠাসিয়া গুরুর প্রসাদ খাইলাম, ক্ষুধার চেয়ে অজীর্ণের পীড়াতেই বেশি ভোগাইল। পৃথিবীতে মানুষকে ঘর তৈরি করিতে, ঘর রক্ষা করিতে, অন্তত ঘর-ভাড়া করিতে হয় সে কথা একেবারে ভুলিয়া বসিয়াছিলাম; আমরা কেবল জানিতাম যে ঘরে বাস করিতে হয়। গৃহস্থ যে কোন্‌খানে হাত পা গুটাইয়া একটুখানি জায়গা করিয়া লইবে সে কথা আমরা ভাবি নাই, কিন্তু আমরা যে কোথায় দিব্য হাত পা ছড়াইয়া আরাম করিয়া থাকিব গৃহস্থেরই মাথায় মাথায় সেই ভাবনা ছিল।

তখন মনে পড়িল জ্যাঠামশায় শচীশকে তাঁর বাড়ি উইল লিখিয়া দিয়াছেন। উইলটা যদি শচীশের হাতে থাকিত তবে এতদিনে ভাবের স্রোতে রসের ঢেউয়ে কাগজের নৌকাখানার মত সেটা ডুবিয়া যাইত। সেটা ছিল আমার কাছে,—আমিই ছিলাম এক্‌জিকিউটর। উইলে কতকগুলি সর্ত্ত ছিল, সেগুলা যাহাতে চলে

সেটার ভার আমার উপরে। তার মধ্যে প্রধান তিনটা এই, কোনোদিন এ বাড়িতে পূজা অর্চ্চনা হইতে পারিবে না, নীচের তলায় পাড়ার মুসলমান চামার ছেলেদের জন্য নাইট্‌স্কুল বসিবে, আর শচীশের মৃত্যুর পর সমস্ত বাড়িটাই ইহাদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য দান করিতে হইবে। পৃথিবীতে পুণ্যের উপরে জ্যাঠা-মশায়ের সব চেয়ে রাগ ছিল; তিনি বৈষয়িকতার চেয়ে এটাকে অনেক বেশি নোংরা বলিয়া ভাবিতেন, পাশের বাড়ির ঘোরতর পুণ্যের হাওয়াটাকে কাটাইয়া দিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। ইংরাজিতে তিনি ইহাকে বলিতেন স্যানিটারি প্রিকশন্‌স্।

শচীশকে বলিলাম, চল এবার সেই কলিকাতার বাড়িতে।

শচীশ বলিল, এখনো তার জন্য ভালো করিয়া তৈরি হইতে পারি নাই।

তার কথা বুঝিতে পারিলাম না। সে বলিল, একদিন বুদ্ধির উপর ভর করিলাম দেখিলাম সেখানে জীবনের সব ভার সয় না। আর-একদিন রসের উপর ভর করিলাম দেখিলাম সেখানে তলা বলিয়া জিনিষটাই নাই। বুদ্ধিও আমার নিজের, রসও যে তাই। নিজের উপরে নিজে দাঁড়ানো চলে না। একটা আশ্রয় না পাইলে আমি সহরে ফিরিতে সাহস করি না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করিতে হইবে বল।

শচীশ বলিল—তোমরা দুজনে যাও, আমি কিছুদিন একলা ফিরিব। একটা যেন কিনারার মত দেখিতেছি, এখন যদি তার দিশা হারাই তবে আর খুঁজিয়া পাইব না।

আড়ালে আসিয়া দামিনী আমাকে বলিল, সে হয় না। একলা

ফিরিবেন, উঁহার দেখাশুনা করিবে কে? সেই যে একবার একলা বাহির হইয়াছিলেন, কি চেহারা লইয়া ফিরিয়াছিলেন সে কথা মনে করিলে আমার ভয় হয়।

সত্য কথা বলিব? দামিনীর এই উদ্বেগে আমার মনে যেন একটা রাগের ভীমরুল হুল ফুটাইয়া দিল—জ্বালা করিতে লাগিল। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর শচীশ ত প্রায় দু'বছর একলা ফিরিয়াছিল—মারা ত পড়ে নাই। মনের ভাব চাপা রহিল না—একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বলিয়া ফেলিলাম।

দামিনী বলিল, শ্রীবিলাসবাবু, মানুষের মরিতে অনেক সময় লাগে সে আমি জানি। কিন্তু একটুও দুঃখ পাইতে দিব কেন, আমরা যখন আছি!

আমরা! বহুবচনের অন্তত আধখানা অংশ এই হতভাগা শ্রীবিলাস। পৃথিবীতে একদলের লোককে দুঃখ হইতে বাঁচাইবার জন্য আর-এক দলকে দুঃখ পাইতে হইবে। এই দুই জাতের মানুষ লইয়া সংসার। আমি যে কোন্ জাতের দামিনী তাহা বুঝিয়া লইয়াছে। যাক্,দলে টানিল এই আমার সুখ।

শচীশকে গিয়া বলিলাম, বেশ ত, সহরে এখনি নাই গেলাম। নদীর ধারে ঐ যে পোড়ো বাড়ি আছে ওখানে কিছুদিন কাটানো যাক্। বাড়িটাতে ভূতের উৎপাত আছে বলিয়া গুজব, অতএব মানুষের উৎপাত ঘটিবে না।

শচীশ বলিল, আর তোমরা?

আমি বলিলাম, আমরা ভূতের মতই যতটা পারি গা ঢাকা দিয়া থাকিব।

শচীশ দামিনীর মুখের দিকে একবার চাহিল। সে চাহনিতে হয় ত একটু ভয় ছিল।

দামিনী হাত-জোড় করিয়া বলিল,—তুমি আমার গুরু। আমি যত পাপিষ্ঠা হই আমাকে সেবা করিবার অধিকার দিয়ো।

যাই বল আমি শচীশের এই সাধনার ব্যাকুলতা বুঝিতে পারি না। "একদিন ত এ জিনিষটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি, এখন, আর যাই হোক্, হাসি বন্ধ হইয়া গেছে। আলেয়ার আলো নয়, এ যে আগুন। শচীশের মধ্যে ইহার দাহটা যখন দেখিলাম তখন ইহাকে লইয়া জ্যাঠামশায়ের চ্যালাগিরি করিতে আর সাহস হইল না। কোন্ ভূতের বিশ্বাসে ইহার আদি এবং কোন্ অদ্ভুতের বিশ্বাসে ইহার অন্ত তাহা লইয়া হার্বার্ট স্পেন্সরের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া কি হইবে—স্পষ্ট দেখিতেছি শচীশ জ্বলিতেছে, তার জীবনটা একদিক হইতে আর-এক দিক পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল।

এতদিন সে নাচিয়া গাহিয়া কাঁদিয়া গুরুর সেবা করিয়া দিনরাত অস্থির ছিল, সে একরকম ছিল ভালো। মনের সমস্ত চেষ্টা প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ফুঁকিয়া দিয়া একেবারে সে নিজেকে দেউলে করিয়া দিত। এখন স্থির হইয়া বসিয়াছে, মনটাকে আর চাপিয়া রাখিবার জো নাই। আর অনুভূতিতে তলাইয়া যাওয়া নয়, এখন উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ভিতরে ভিতরে এমন লড়াই চলিতেছে যে তার মুখ দেখিলে ভয় হয়।

আমি একদিন আর থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, দেখ

শচীশ, আমার বোধ হয় তোমার একজন কোনো গুরুর দরকার, যার উপরে ভর করিয়া তোমার সাধনা সহজ হইবে।

শচীশ বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, চুপ কর, বিশ্রী, চুপ কর—সহজকে কিসের দরকার? ফাঁকিই সহজ, সত্য কঠিন।

আমি ভয়ে ভয়ে বলিলাম, সত্যকে পাইবার জন্যই ত পথ দেখাইবার—

শচীশ অধীর হইয়া বলিল, ওগো এ তোমার ভূগোল-বিবরণের সত্য নয়—আমার অন্তর্যামী কেবল আমার পথ দিয়াই আনাগোনা করেন—গুরুর পথ গুরুর আঙিনাতেই যাওয়ার পথ।

এই এক-শচীশের মুখ দিয়া কতবার যে কত উল্টা কথাই শোনা গেল! আমি শ্রীবিলাস, জ্যাঠামশায়ের চ্যালা বটে, কিন্তু তাঁকে গুরু বলিলে তিনি আমাকে চ্যালাকাঠ লইয়া মারিতে আসিতেন সেই-আমাকে দিয়া শচীশ গুরুর পা টিপাইয়া লইল, আবার দুদিন না যাইতেই সেই-আমাকেই এই বক্তৃতা! আমার হাসিতে সাহস হইল না, গম্ভীর হইয়া রহিলাম।

শচীশ বলিল, আজ আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ কথাটার অর্থ কি। আর সব জিনিষ পরের হাত হইতে লওয়া যায় কিন্তু ধর্ম্ম যদি নিজের না হয় তবে তাহা মারে, বাঁচায় না। আমার ভগবান অন্যের হাতের মুষ্টিভিক্ষা নহেন, যদি তাঁকে পাই ত আমিই তাঁকে পাইব নহিলে নিধনং শ্রেয়ঃ।

তর্ক করা আমার স্বভাব, আমি সহজে ছাড়িবার পাত্র নই; আমি বলিলাম, যে কবি সে মনের ভিতর হইতে কবিতা পায়, যে কবি নয় সে অন্যের কাছ হইতে কবিতা নেয়।

শচীশ অম্লানমুখে বলিল, আমি কবি।

বাস্ চুকিয়া গেল, চুলিয়া আসিলাম।

শচীশের খাওয়া নাই শোওয়া নাই, কখন্ কোথায় থাকে হুঁস্ থাকে না। শরীরটা প্রতিদিনই যেন অতি-শান-দেওয়া ছুরির মত সূক্ষ্ম হইয়া আসিতে লাগিল। দেখিলে মনে হইত, আর সহিবে না। তবু আমি তাকে ঘাঁটাইতে সাহস করিতাম না। কিন্তু দামিনী সহিতে পারিত না। ভগবানের উপরে সে বিষম রাগ করিত—যে তাঁকে ভক্তি করে না তার কাছে তিনি জব্দ, আর ভক্তের উপর দিয়াই কি এমন করিয়া তার শোধ তুলিতে হয় গা? লীলানন্দ স্বামীর উপর রাগ করিয়া দামিনী মাঝে মাঝে সেটা বেশ শক্ত করিয়া জানান্ দিত কিন্তু ভগবানের নাগাল পাইবার উপায় ছিল না।

তবু শচীশকে সময়মত নাওয়ানো-খাওয়ানোর চেষ্টা করিতে সে ছাড়িত না। এই খাপছাড়া মানুষটাকে নিয়মে বাঁধিবার জন্য সে যে কত রকম ফিকিরফন্দী করিত তার আর সংখ্যা ছিল না।

অনেক দিন শচীশ ইহার স্পষ্ট কোনো প্রতিবাদ করে নাই। একদিন সকালেই নদীপার হইয়া ওপারে বালুচরে সে চলিয়া গেল। সূর্য্য মাঝ-আকাশে উঠিল, তারপরে সূর্য্য পশ্চিমের দিকে হেলিল, শচীশের দেখা নাই। দামিনী অভুক্ত থাকিয়া অপেক্ষা করিল, শেষে আর থাকিতে পারিল না। খাবারের থালা লইয়া হাঁটুজল ভাঙিয়া সে ওপারে গিয়া উপস্থিত।

চারিদিক ধূধূ করিতেছে—জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। রৌদ্র যেমন

নিঃশব্দ নিষ্ঠুর, বালির ঢেউগুলাও তেমনি। তা'রা যেন শূন্যতার পাহারাওয়ালা, গুঁড়ি মারিয়া সব বসিয়া আছে।

যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই এমন একটা সীমানা-হারা ফ্যাকাসে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল। এখানে যেন সব মুছিয়া গিয়া একেবারে গোড়ার সেই শুক্‌নো সাদায় গিয়া পৌঁছিয়াছে! পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে, একটা না। তার না আছে শব্দ, না আছে গতি। তাহাতে না আছে রক্তের লাল, না আছে গাছপালার সবুজ, না আছে আকাশের নীল, না আছে মাটির গেরুয়া। যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি, যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।

কোন্‌দিকে যাইবে ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ বালির উপরে পায়ের দাগ চোখে পড়িল। সেই দাগ ধরিয়া চলিতে চলিতে যেখানে গিয়া সে পৌঁছিল সেখানে একটা জলা। তার ধারে ধারে ভিজা মাটির উপরে অসংখ্য পাখীর পদচিহ্ন। সেইখানে বালির পাড়ির ছায়ায় শচীশ বসিয়া। সাম্‌নের জলটি একেবারে নীলে নীল, ধারে ধারে চঞ্চল কাদাখোঁচা ল্যাজ নাচাইয়া সাদা-কালো ডানার ঝলক দিতেছে। কিছু দূরে চখাচখীর দল ভারি গোলমাল করিতে করিতে কিছুতেই পিঠের পালক পুরাপুরি মনের মত সাফ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দামিনী পাড়ির উপর দাঁড়াইতেই তারা ডাকিতে ডাকিতে ডানা মেলিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

দামিনীকে দেখিয়া শচীশ বলিয়া উঠিল—এখানে কেন?

দামিনী বলিল, খাবার আনিয়াছি।

শচীশ বলিল, খাইব না।

দামিনী বলিল, অনেক বেলা হইয়া গেছে।

শচীশ কেবল বলিল, না।

দামিনী বলিল, আমি না হয় একটু বসি তুমি আর একটু পরে—

শচীশ বলিয়া উঠিল, আহা কেন আমাকে তুমি—

হঠাৎ দামিনীর মুখ দেখিয়া সে থামিয়া গেল। দামিনী আর কিছু বলিল না, থালা হাতে করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। চারিদিকে শূন্য বালি রাত্রিবেলাকার বাঘের চোখের মত ঝক্‌ঝক্ করিতে লাগিল।

দামিনীর চোখে আগুন যত সহজে জ্বলে, জল তত সহজে পড়ে না। কিন্তু সেদিন যখন তাকে দেখিলাম, দেখি সে মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া; চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া তার কান্না যেন বাঁধ ভাঙিয়া ছুটিয়া পড়িল। আমার বুকের ভিতরটা কেমন করিতে লাগিল। আমি একপাশে বসিলাম।

একটু সে সুস্থ হইলে আমি তাকে বলিলাম, শচীশের শরীরের জন্য তুমি এত ভাব কেন?

দামিনী বলিল, আর কিসের জন্য আমি ভাবিতে পারি বল? আর সব ভাবনা ত উনি আপনিই ভাবিতেছেন। আমি কি তার কিছু বুঝি, না আমি তার কিছু করিতে পারি?

আমি বলিলাম, দেখ, মানুষের মন যখন অত্যন্ত জোরে কিছু একটাতে গিয়া ঠেকে তখন আপনিই তার শরীরের সমস্ত

প্রয়োজন কমিয়া যায়। সেই জন্যেই বড় দুঃখে কিম্বা বড় আনন্দে মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না। এখন শচীশের যে রকম মনের অবস্থা তাতে ওর শরীরের দিকে যদি মন না দাও ওর ক্ষতি হইবে না।

দামিনী বলিল, আমি যে স্ত্রীজাত—ঐ শরীরটাকেই ত দেহ দিয়া প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা আমাদের স্বধর্ম্ম। ও-যে একেবারে মেয়েদের নিজের কীর্ত্তি। তাই যখন দেখি শরীরটা কষ্ট পাইতেছে তখন এত সহজে আমাদের মন কাঁদিয়া উঠে।"

আমি বলিলাম, তাই যারা কেবল মন লইয়া থাকে শরীরের অভিভাবক তোমাদের তারা চোখেই দেখিতে পায় না।

দামিনী দৃপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, পায় না বই কি! তারা আবার এমন করিয়া দেখে যে সে একটা অনাসৃষ্টি!

মনে মনে বলিলাম, সেই অনাসৃষ্টিটার পরে তোমাদের লোভের সীমা নাই।—ওরে ও শ্রীবিলাস, জন্মান্তরে যেন সৃষ্টিছাড়ার দলে জন্ম নিতে পারিস্ এমন পুণ্য কর্!

৩

সেদিন নদীর চরে শচীশ দামিনীকে অমন একটা শক্ত ঘা দিয়া তার ফল হইল, দামিনীর সেই কাতর দৃষ্টি শচীশ মন হইতে সরাইতে পারিল না। তারপর কিছুদিন সে দামিনীর পরে একটু বিশেষ যত্ন দেখাইয়া অনুতাপের ব্রত যাপন করিতে লাগিল। অনেক দিন সে ত আমাদের সঙ্গে ভালো করিয়া কথাই কয় নাই, এখন সে দামিনীকে কাছে ডাকিয়া তার সঙ্গে আলাপ

করিতে লাগিল। যে সব তার অনেক ধ্যানের অনেক চিন্তার কথা সেই ছিল তার আলাপের বিষয়।

দামিনী শচীশের ঔদাসীন্যকে ভয় করিত না কিন্তু এই যত্নকে তার বড় ভয়। সে জানিত এতটা সহিবে না, কেননা এর দাম বড় বেশি। একদিন হিসাবের দিকে যেই শচীশের নজর পড়িবে, দেখিবে খরচ বড় বেশি পড়িতেছে, সেই দিনই বিপদ। শচীশ অত্যন্ত ভালো ছেলের মত বেশ নিয়মমত স্নানাহার করে ইহাতে দামিনীর বুক দুরদুর করে, কেমন তার লজ্জা বোধ হয়। শচীশ অবাধ্য হইলে সে যেন বাঁচে। সে মনে মনে বলে—সেদিন তুমি আমাকে দূর করিয়া দিয়াছিলে ভালোই করিয়াছ। আমাকে এই যত্ন এ যে তোমার আপনাকে শাস্তি দেওয়া। এ আমি সহিব কি করিয়া?—দামিনী ভাবিল, দূর হোক্‌গে ছাই, এখানেও দেখিতেছি মেয়েদের সঙ্গে সই পাতাইয়া আবার আমাকে পাড়া ঘুরিতে হইবে।

একদিন রাত্রে হঠাৎ ডাক পড়িল, বিশ্রী, দামিনী!—তখন রাত্রি একটাই হইবে কি দুটাই হইবে শচীশের সে খেয়ালই নাই। রাত্রে শচীশ কি কাণ্ড করে তা জানিনা—কিন্তু এটা নিশ্চয়, তার উৎপাতে এই ভুতুড়ে বাড়িতে ভূতগুলা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা ঘুম হইতে ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া বাহির হইয়া দেখি শচীশ বাড়ির সামনে বাঁধানো চাতালটার উপর অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে। সে বলিয়া উঠিল, আমি বেশ করিয়া বুঝিয়াছি। মনে একটুও সন্দেহ নাই।

দামিনী আস্তে আস্তে চাতালটার উপরে বসিল, শচীশও তার অনুকরণ করিয়া অন্যমনে বসিয়া পড়িল। আমিও বসিলাম।

শচীশ বলিল, যে মুখে তিনি আমার দিকে আসিতেছেন আমি যদি সেই মুখেই চলিতে থাকি তবে তাঁর কাছ থেকে কেবল সরিতে থাকিব, আমি ঠিক উল্টা মুখে চলিলে তবেই ত মিলন হইবে।

আমি চুপ করিয়া তার জ্বল্‌জ্বল্-করা চোখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে যা বলিল রেখাগণিত-হিসাবে সে কথাটা ঠিক, কিন্তু ব্যাপারটা কি?

শচীশ বলিয়া চলিল, তিনি রূপ ভালোবাসেন তাই কেবলি রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা ত শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত তাই তাঁর লীলা বন্ধনে, আমরা বদ্ধ সেই জন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। এ কথাটা বুঝিনা বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ।

তারাগুলা যেমন নিস্তব্ধ আমরা তেমনি নিস্তব্ধ হইয়াই রহিলাম। শচীশ বলিল, দামিনী, বুঝিতে পারিতেছ না? গান যে করে সে আনন্দের দিক হইতে রাগিণীর দিকে যায়, গান যে শোনে সে রাগিণীর দিক হইতে আনন্দের দিকে যায়। একজন আসে মুক্তি হইতে বন্ধনে, আর-একজন যায় বন্ধন হইতে মুক্তিতে, তবে ত দুই পক্ষের মিল হয়। তিনি যে গাহিতেছেন আর আমরা যে শুনিতেছি। তিনি বাঁধিতে বাঁধিতে শোনান, আমরা খুলিতে খুলিতে শুনি।

দামিনী শচীশের কথা বুঝিতে পারিল কি না জানি না, কিন্তু

শচীশকে বুঝিতে পারিল। কোলের উপর হাত-জোড় করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

শচীশ বলিল, এতক্ষণ আমি অন্ধকারের এক কোণটিতে চুপটি করিয়া বসিয়া সেই ওস্তাদের গান শুনিতেছিলাম, শুনিতে শুনিতে হঠাৎ সমস্ত বুঝিলাম। আর থাকিতে পারিলাম না, তাই তোমাদের ডাকিয়াছি। এতদিন আমি তাঁকে আপনার মত করিয়া বানাইতে গিয়া কেবল ঠকিলাম। ওগো আমার প্রলয়, আপনাকে আমি তোমার মধ্যে চুরমার করিতে থাকিব—চিরকাল ধরিয়া! বন্ধন আমার নয় বলিয়াই কোনো বন্ধনকে ধরিয়া রাখিতে পারি না,—আর বন্ধন তোমারই বলিয়াই অনন্তকালে তুমি সৃষ্টির বাঁধন ছাড়াইতে পারিলে না। থাকো, আমার রূপ লইয়া তুমি থাকো, আমি তোমার অরূপের মধ্যে ডুব মারিলাম।

অসীম, তুমি আমার, তুমি আমার,—এই বলিতে বলিতে শচীশ উঠিয়া অন্ধকারে নদীর পাড়ির দিকে চলিয়া গেল।

৪

সেই রাত্রির পর আবার শচীশ সাবেক চাল ধরিল, তার নাওয়া-খাওয়ার ঠিকঠিকানা রহিল না। কখন্ যে তার মনের ঢেউ আলোর দিকে ওঠে, কখন্ যে তাহা অন্ধকারের দিকে নামিয়া যায় তাহা ভাবিয়া পাই না। এমন মানুষকে ভদ্রলোকের ছেলেটির মত বেশ খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া সুস্থ করিয়া রাখিবার ভার যে লইয়াছে ভগবান তার সহায় হোন্!

সেদিন সমস্তদিন গুমট করিয়া হঠাৎ রাত্রে তারি একটা ঝড়

আসিল। আমরা তিনজনে তিনটা ঘরে শুই, তার সাম্‌নের বারান্দায় কেরোসিনের একটা ডিবা জ্বলে। সেটা নিবিয়া গেছে। নদী তোলপাড় করিয়া উঠিয়াছে, আকাশ ভাঙিয়া মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। সেই নদীর ঢেউয়ের ছলচ্ছল আর আকাশের জলের ঝরঝর শব্দে উপরে নীচে মিলিয়া প্রলয়ের আসরে ঝমাঝম করতাল বাজাইতে লাগিল। জমাট অন্ধকারের গর্ভের মধ্যে কি যে নড়াচড়া চলিতেছে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না অথচ তার নানা রকমের আওয়াজে সমস্ত আকাশটা অন্ধ ছেলের মত ভয়ে হিম হইয়া উঠিতেছে। বাঁশবনের মধ্যে যেন একটা বিধবা প্রেতিনীর কান্না, আমবাগানের মধ্যে ডালপালাগুলার ঝপাঝপ শব্দ, দূরে মাঝে মাঝে নদীর পাড়ি ভাঙিয়া হুড়মুড় হুড়হুড় করিয়া উঠিতেছে, আর আমাদের জীর্ণ বাড়িটার পাঁজরগুলার ফাঁকের ভিতর দিয়া বারবার বাতাসের তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধিয়া সে কেবলি একটা জন্তুর মত হুহু করিয়া চীৎকার করিতেছে।

এই রকম রাতে আমাদের মনেরও জানলা-দরজার ছিট্‌কিনীগুলা নড়িয়া যায়, ভিতরে ঝড় ঢুকিয়া পড়ে, ভদ্র আস্‌বাবগুলাকে উলট্‌-পালট করিয়া দেয়, পর্দ্দাগুলা ফর্‌ফর্‌ করিয়া কে কোন্‌দিকে যে অদ্ভুত রকম করিয়া উড়িতে থাকে তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। আমার ঘুম হইতেছিল না। বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া কি সব কথা ভাবিতেছিলাম তাহা এখানে লিখিয়া কি হইবে? এই ইতিহাসে সেগুলো জরুরী কথা নয়।

এমন সময়ে শচীশ একবার তার ঘরের অন্ধকারের মধ্যে বলিয়া উঠিল, কেও?

উত্তর শুনিল, আমি দামিনী। তোমার জানলা খোলা, ঘরে বৃষ্টির ছাঁট আসিতেছে। বন্ধ করিয়া দিই।

বন্ধ করিতে করিতে দেখিল, শচীশ বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িয়াছে। মুহূর্ত্তকালের জন্য যেন দ্বিধা করিয়া তার পরে বেগে ঘর হইতে সে বাহির হইয়া গেল। বিদ্যুৎ চমক দিতে লাগিল এবং একটা চাপা বজ্র গরগর করিয়া উঠিল।

দামিনী অনেকক্ষণ নিজের ঘরের চৌকাঠের পরে বসিয়া রহিল। কেহই ফিরিয়া আসিল না। দমকা হাওয়ার অধৈর্য্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিল।

দামিনী আর থাকিতে পারিল না, বাহির হইয়া পড়িল। বাতাসে দাঁড়ানো দায়। মনে হইল দেবতার পেয়াদাগুলা তাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে ঠেলা দিয়া লইয়া চলিয়াছে। অন্ধকার আজ সচল হইয়া উঠিল। বৃষ্টির জল আকাশের সমস্ত ফাঁক ভরাট করিবার জন্য প্রাণপণে লাগিয়াছে। এমনি করিয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ডুবাইয়া কাঁদিতে পারিলে দামিনী বাঁচিত।

হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ অন্ধকারটাকে আকাশের একধার হইতে আর-একধার পর্য্যন্ত পড়পড় শব্দ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। সেই ক্ষণিক আলোকে দামিনী দেখিতে পাইল শচীশ নদীর ধারে দাঁড়াইয়া। দামিনী প্রাণপণ শক্তিতে উঠিয়া পড়িয়া একদৌড়ে একেবারে তার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল; বাতাসের চীৎকার-শব্দকে হার মানাইয়া বলিয়া উঠিল,—এই তোমার পা ছুঁইয়া বলিতেছি আজ তোমার কাছে অপরাধ করি নাই, কেন তবে আমাকে এমন করিয়া শাস্তি দিতেছ?

শচীশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দামিনী বলিল, আমাকে লাথি মারিয়া নদীর মধ্যে ফেলিয়া দিতে চাও ত ফেলিয়া দাও, কিন্তু তুমি ঘরে চল।

শচীশ বাড়িতে ফিরিয়া আসিল। ভিতরে ঢুকিয়াই বলিল—যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড় দরকার—আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া কর, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।

দামিনী একটুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার পরে বলিল, তাই আমি যাইব।

৫

পরে আমি দামিনীর কাছে আগাগোড়া সকল কথাই শুনিয়াছি কিন্তু সেদিন কিছুই জানিতাম না। তাই বিছানা হইতে যখন দেখিলাম এরা দুজনে সাম্‌নের বারান্দা দিয়া আপন আপন ঘরের দিকে গেল তখন মনে হইল আমার দুর্ভাগ্য বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আমার গলা টিপিয়া ধরিতেছে। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম, সে রাত্রে আমার আর ঘুম হইল না!

পরের দিন সকালে দামিনীর সে কি চেহারা! কাল রাত্রে ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য পৃথিবীর মধ্যে কেবল যেন এই মেয়েটির উপরেই আপনার সমস্ত পদচিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেছে। ইতিহাসটা কিছুই না জানিয়াও শচীশের উপর আমার ভারি রাগ হইতে লাগিল।

দামিনী আমাকে বলিল, শ্রীবিলাসবাবু, তুমি আমাকে কলিকাতায় পৌঁছাইয়া দিবে চল।

এটা যে দামিনীর পক্ষে কত বড় কঠিন কথা সে আমি বেশ জানি কিন্তু আমি তাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম না। ভারি একটা বেদনার মধ্যেও আমি আরাম পাইলাম। দামিনীর এখান হইতে যাওয়াই ভালো। পাহাড়টার উপর ঠেকিতে ঠেকিতে নৌকাটি যে চুরমার হইয়া গেল!

বিদায় লইবার সময় দামিনী শচীশকে প্রণাম করিয়া বলিল, শ্রীচরণে অনেক অপরাধ করিয়াছি, মাপ করিয়ো।

শচীশ মাটির দিকে চোখ নামাইয়া বলিল, আমিও অনেক অপরাধ করিয়াছি, সমস্ত মাজিয়া ফেলিয়া ক্ষমা লইব।

দামিনীর মধ্যে একটা প্রলয়ের আগুন জ্বলিতেছে কলিকাতার পথে আসিতে আসিতে তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। তারই তাপ লাগিয়া আমারও মনটা যেদিন বড় বেশি তাতিয়া উঠিয়াছিল সেদিন আমি শচীশকে উদ্দেশ করিয়া কিছু কড়া কথা বলিয়াছিলাম। দামিনী রাগিয়া বলিল, দেখ তুমি তাঁর সম্বন্ধে আমার সাম্‌নে অমন কথা বলিয়ো না। তিনি আমাকে কি-বাঁচান্ বাঁচাইয়াছেন তুমি তার কি জান! তুমি কেবল আমারই দুঃখের দিকে তাকাও—আমাকে বাঁচাইতে গিয়া তিনি যে দুঃখটা পাইয়াছেন সেদিকে বুঝি তোমার দৃষ্টি নাই? সুন্দরকে মারিতে গিয়াছিল তাই অসুন্দরটা বুকে লাথি খাইয়াছে। বেশ হইয়াছে, বেশ হইয়াছে, খুব ভালো হইয়াছে!—বলিয়া দামিনী বুকে দম্‌দম্ করিয়া কিল মারিতে লাগিল। আমি তার হাত চাপিয়া ধরিলাম।

কলিকাতায় সন্ধ্যার সময় আসিয়া তখনি দামিনীকে তার মাসির বাড়ি দিয়া আমি আমার এক পরিচিত মেসে উঠিলাম। আমার

জানা লোকে যে আমাকে দেখিল চমকিয়া উঠিল, বলিল, এ কি, তোমার অসুখ করিয়াছে নাকি ?

পরদিন প্রথম ডাকেই দামিনীর চিঠি পাইলাম, আমাকে লইয়া যাও, এখানে আমার স্থান নাই।

মাসি দামিনীকে ঘরে রাখিবে না। আমাদের নিন্দায় না কি সহরে ঢ়ী-ঢি পড়িয়া গেছে। আমরা দল ছাড়ার অল্পকাল পরে সাপ্তাহিক কাগজগুলির পূজার সংখ্যা বাহির হইয়াছে; সুতরাং আমাদের হাড়কাঠ তৈরি ছিল; রক্তপাতের ত্রুটি হয় নাই। শাস্ত্রে স্ত্রীপশু বলি নিষেধ, কিন্তু মানুষের বেলায় ঐটেতেই সব চেয়ে উল্লাস। কাগজে দামিনীর স্পষ্ট করিয়া নাম ছিল না কিন্তু বদনামটা কিছুমাত্র অস্পষ্ট যাতে না হয় সে কৌশল ছিল। কাজেই দূর-সম্পর্কের মাসির বাড়ি দামিনীর পক্ষে ভয়ঙ্কর আঁট হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে দামিনীর বাপ মা মারা গেছে কিন্তু ভাইরা কেহ কেহ আছে বলিয়াই জানি। দামিনীকে তাদের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলাম, সে ঘাড় নাড়িল। বলিল, তারা বড় গরিব।

আসল কথা, দামিনী তাদের মুস্কিলে ফেলিতে চায় না। ভয় ছিল, ভাইরাও পাছে জবাব দেয়, এখানে জায়গা নাই। সে আঘাত যে সহিবে না। জিজ্ঞাসা করিলাম—তা হইলে কোথায় যাইবে ?

দামিনী বলিল, লীলানন্দ স্বামীর কাছে।

লীলানন্দ স্বামী! খানিকক্ষণ আমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। অদৃষ্টের এ কি নিদারুণ লীলা!

বলিলাম, স্বামীজি কি তোমাকে লইবেন ?

দামিনী বলিল, খুসি হইয়া লইবেন।

দামিনী মানুষ চেনে। যারা দল-চরের জাত মানুষকে পাইলে সত্যকে পাওয়ার চেয়ে তারা বেশি খুসি হয়। লীলানন্দ স্বামীর ওখানে দামিনীর জায়গার টানাটানি হইবে না এটা ঠিক—কিন্তু—।

ঠিক এমন সঙ্কটের সময় বলিলাম, দামিনী, একটি পথ আছে, যদি অভয় দাও ত বলি।

দামিনী বলিল, বল শুনি।

আমি বলিলাম, যদি আমার মত মানুষকে বিবাহ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তবে—

দামিনী আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিল—ও কি কথা বলিতেছ শ্রীবিলাসবাবু ? তুমি কি পাগল হইয়াছ ?

আমি বলিলাম, মনে করনা পাগলই হইয়াছি। পাগল হইলে অনেক কঠিন কথা অতি সহজে মীমাংসা করিবার শক্তি জন্মায়। পাগলামি আরব উপন্যাসের সেই জুতা যা পায়ে দিলে সংসারের হাজার হাজার বাজে কথাগুলো একেবারে ডিঙাইয়া যাওয়া যায়।

বাজে কথা ? কাকে তুমি বল বাজে কথা ?

এই যেমন, লোকে কি বলিবে ? ভবিষ্যতে কি ঘটিবে ? ইত্যাদি ইত্যাদি।

দামিনী বলিল, আর আসল কথা ?

আমি বলিলাম, কাকে বল তুমি আসল কথা ?

এই যেমন আমাকে বিবাহ করিলে তোমার কি দশা হইবে ?

এইটেই যদি আসল কথা হয় তবে আমি নিশ্চিন্ত। কেননা

আমার দশা এখন যা আছে তার চেয়ে খারাপ হইবে না। দশাটাকে সম্পূর্ণ ঠাঁই-বদল করাইতে পারিলেই বাঁচিতাম, অন্তত পক্ষে পাশ ফিরাইতে পারিলেও একটুখানি আরাম পাওয়া যায়।

আমার মনের ভাব-সম্বন্ধে দামিনী কোনোরকম তারে-খবর পায় নাই সে কথা বিশ্বাস করি না। কিন্তু এতদিন সে খবরটা তার কাছে দরকারী খবর ছিল না—অন্তত তার কোনো রকম জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ছিল। এতদিন পরে একটা জবাবের দাবি উঠিল।

দামিনী চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। আমি বলিলাম, দামিনী, আমি সংসারে অত্যন্ত সাধারণ মানুষদের মধ্যে একজন—এমন কি, আমি তার চেয়েও কম, আমি তুচ্ছ। আমাকে বিবাহ করাও যা, না করাও তা, অতএব তোমার ভাবনা কিছুই নাই।

দামিনীর চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সে বলিল, তুমি যদি সাধারণ মানুষ হইতে তবে কিছুই ভাবিতাম না।

আরো খানিকক্ষণ ভাবিয়া দামিনী আমাকে বলিল, তুমি ত আমাকে জান।

আমি বলিলাম, তুমিও ত আমাকে জান।

এমনি করিয়াই কথাটা পাড়া হইল। যে সব কথা মুখে বলা হয় নাই তারই পরিমাণ বেশি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি একদিন আমার ইংরেজি বক্তৃতায় অনেক মন বশ করিয়াছি। এতদিন ফাঁক পাইয়া তাদের অনেকেরই নেশা ছুটিয়াছে।

কিন্তু মরেন এখনো আমাকে বর্ত্তমান যুগের একটা দৈবলব্ধ

জিনিষ বলিয়াই জানিত। তার একটা বাড়িতে ভাড়াটে আসিতে মাসদেড়েক দেরি ছিল। আপাতত সেইখানে আমরা আশ্রয় লইলাম।

প্রথম দিনে আমার প্রস্তাবটা চাকা ভাঙিয়া যে মৌনের গর্ত্তটার মধ্যে পড়িল, মনে হইয়াছিল এইখানেই বুঝি হাঁ এবং না দুইয়েরই বাহিরে পড়িয়া সেটা আটক খাইয়া গেল; অন্তত অনেক মেয়ামত এবং অনেক হেঁইহুঁই করিয়া যদি ইহাকে টানিয়া তোলা যায়। কিন্তু অভাবনীয় পরিহাসে মনোবিজ্ঞানকে ফাঁকি দিবার জন্যই মনের সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্ত্তার সেই আনন্দের উচ্চ হাস্য এবারকার ফাল্গুনে এই ভাড়াটে বাড়ির দেয়াল ক'টার মধ্যে বারবার ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া উঠিল।

আমি যে একটা-কিছু, দামিনী এতদিন সে কথা লক্ষ্য করিবার সময় পায় নাই, বোধ করি আর কোনো দিক হইতে তার চোখে বেশি একটা আলো পড়িয়াছিল। এবারে তার সমস্ত জগৎ সঙ্কীর্ণ হইয়া সেইটুকুতে আসিয়া ঠেকিল যেখানে আমিই কেবল একলা। কাজেই আমাকে সম্পূর্ণ চোখ মেলিয়া দেখা ছাড়া আর উপায় ছিল না। আমার ভাগ্য ভালো, তাই ঠিক এই সময়টাতেই দামিনী আমাকে যেন প্রথম দেখিল।

অনেক নদী পর্ব্বতে সমুদ্রতীরে দামিনীর পাশে পাশে ফিরিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতালের ঝড়ে রসের তানে বাতাসে আগুন লাগিয়াছে; "তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি", এই পদের শিখা নূতন নূতন আখরে স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়াছে। তবু পর্দ্দা পুড়িয়া যায় নাই।

কিন্তু কলিকাতার এই গলিতে এ কি হইল? ঘেঁষাঘেঁষি ঐ বাড়িগুলো চারিদিকে যেন পারিজাতের ফুলের মত ফুটিয়া উঠিল। বিধাতা তাঁর বাহাদুরি দেখাইলেন বটে! এই ইঁটকাঠগুলোকে তিনি তাঁর গানের সুর করিয়া তুলিলেন। আর, আমার মত সামান্য মানুষের উপর তিনি কি পরশমণি ছোঁয়াইয়া দিলেন আমি এক-মুহূর্ত্তে অসামান্য হইয়া উঠিলাম!

যখন আড়াল থাকে তখন অনন্তকালের ব্যবধান, যখন আড়াল ভাঙে তখন সে এক-নিমেষের পাল্লা। আর দেরি হইল না। দামিনী বলিল, আমি একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম কেবল এই একটা ধাক্কার অপেক্ষা ছিল। আমার সেই-তুমি আর এই-তুমির মাঝখানে ওটা কেবল একটা ঘোর আসিয়াছিল। আমার গুরুকে আমি বারবার প্রণাম করি তিনি আমার এই ঘোর ভাঙাইয়া দিয়াছেন।

আমি দামিনীকে বলিলাম, দামিনী, তুমি অত করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়ো না। বিধাতার এই সৃষ্টিটা যে সুদৃশ্য নয় সে তুমি পূর্ব্বে যখন আবিষ্কার করিয়াছিলে তখন সহিয়াছিলাম কিন্তু এখন সহ্য করা ভারি শক্ত হইবে।

দামিনী কহিল, বিধাতার ঐ সৃষ্টিটা যে সুদৃশ্য আমি সেইটেই আবিষ্কার করিতেছি।

আমি কহিলাম, ইতিহাসে তোমার নাম থাকিবে। উত্তরমেরুর মাঝখানটাতে যে দুঃসাহসিক আপনার নিশান গাড়িবে তার কীর্ত্তিও এর কাছে তুচ্ছ। এ তো দুঃসাধ্য সাধন নয়, এ যে অসাধ্য সাধন।

ফাল্গুন মাসটা এমন অত্যন্ত ছোট্ট তাহা ইহার পূর্ব্বে কখনো

এমন নিঃসংশয়ে বুঝি নাই। কেবলমাত্র ত্রিশটা দিন—দিনগুলাও চব্বিশঘণ্টার এক মিনিট বেশি নয়। বিধাতার হাতে কাল অনন্ত, তবু এমনতর বিশ্রী-রকমের কৃপণতা কেন আমি ত বুঝিতে পারি না!

দামিনী বলিল, তুমি যে এই পাগ্‌লামি করিতে বসিলে তোমার ঘরের লোক—

আমি বলিলাম, তারা আমার সুহৃদ্। এবার তারা আমাকে ঘর থেকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে।

তারপর?

তারপরে তোমায় আমায় মিলিয়া একেবারে বুনিয়াদ হইতে আগাগোড়া নূতন করিয়া ঘর বানাইব—সে কেবল আমাদের দুজনের সৃষ্টি।

দামিনী কহিল, আর সেই ঘরের গৃহিণীকে একেবারে গোড়া হইতে বানাইয়া লইতে হইবে। সেও তোমারই হাতের নূতন সৃষ্টি হোক্, পুরানো কালের ভাঙাচোরা তার কোথাও কিছু না থাক্।

চৈত্রমাসে দিন ফেলিয়া একটা বিবাহের বন্দোবস্ত করা গেল। দামিনী আবদার করিল শচীশকে আনাইতে হইবে।

আমি বলিলাম, কেন?

তিনি সম্প্রদান করিবেন।

সে পাগ্‌লা যে কোথায় ফিরিতেছে তার সন্ধান নাই। চিঠির পর চিঠি লিখি জবাবই পাই না। নিশ্চয়ই এখনো সেই ভুতুড়ে বাড়িতেই আছে নহিলে চিঠি ফেরৎ আসিত। কিন্তু সে কারো চিঠি খুলিয়া পড়ে কিনা সন্দেহ।

আমি বলিলাম, দামিনী, তোমাকে নিজে গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতে হইবে, "পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ, ত্রুটি মার্জ্জনা"—এখানে চলিবে না। একলাই যাইতে পারিতাম কিন্তু আমি ভীতু মানুষ। সে হয় ত এতক্ষণে নদীর ওপারে গিয়া চক্রবাকদের পিঠের পালক সাফ করা তদারক করিতেছে, সেখানে তুমি ছাড়া যাইতে পারে এমন বুকের পাটা আর কারো নাই।

দামিনী হাসিয়া কহিল, সেখানে আর কখনো যাইব না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।

আমি বলিলাম, আহার লইয়া যাইবে না এই প্রতিজ্ঞা—আহারের নিমন্ত্রণ লইয়া যাইবে না কেন?

এবারে কোনো-রকম দুর্ঘটনা ঘটিল না। দুইজনে দুই হাত ধরিয়া শচীশকে কলিকাতায় গ্রেফ্‌তার করিয়া আনিলাম। ছোট ছেলে খেলার জিনিষ পাইলে যেমন খুসি হয় শচীশ আমাদের বিবাহের ব্যাপার লইয়া তেমনি খুসি হইয়া উঠিল। আমরা ভাবিয়াছিলাম চুপচাপ করিয়া সারিব, শচীশ কিছুতেই তা হইতে দিল না। বিশেষত জ্যাঠামশায়ের সেই মুসলমানপাড়ার দল যখন খবর পাইল তখন তারা এমনি হল্লা করিতে লাগিল যে পাড়ার লোকে ভাবিল কাবুলের আমির আসিয়াছে বা, অন্তত হাইদ্রাবাদের নিজাম।

আরো ধুম হইল কাগজে। পর-বারের পূজার সংখ্যায় জোড়া বলি হইল। আমরা অভিশাপ দিব না। জগদম্বা সম্পাদকদের তহবিল বৃদ্ধি করুন এবং পাঠকদের নররক্তের নেশায় অন্তত এবারকার মত কোনো বিঘ্ন না ঘটুক্।

শচীশ বলিল, বিশ্রী, তোমরা আমার বাড়িটা ভোগ কর'লে।

আমি বলিলাম, তুমিও আমাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দাও, আবার আমরা কাজে লাগিয়া যাই।

শচীশ বলিল, না, আমার কাজ অন্যত্র।

দামিনী বলিল, আমাদের বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণ না সারিয়া যাইতে পারিবে না।

বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণে আহূতদের সংখ্যা অসম্ভব রকম অধিক ছিল না। ছিল ঐ শচীশ।

শচীশ ত বলিল আমাদের বাড়িটা আসিয়া ভোগ কর কিন্তু ভোগটা যে কি সে আমরাই জানি। হরিমোহন সে বাড়ি দখল করিয়া ভাড়াটে বসাইয়া দিয়াছেন। নিজেই ব্যবহার করিতেন, কিন্তু পারলৌকিক লাভ-লোকসান-সম্বন্ধে যারা তাঁর মন্ত্রী তারা ভালো বুঝিল না—ওখানে প্লেগে মুসলমান মরিয়াছে। যে ভাড়াটে আসিবে তারও ত একটা—কিন্তু কথাটা তার কাছে চাপিয়া গেলেই হইবে।

বাড়িটা কেমন করিয়া হরিমোহনের হাত হইতে উদ্ধার করা গেল, সে অনেক কথা। আমার প্রধান সহায় ছিল পাড়ার মুসলমানরা। আর কিছু নয় জগমোহনের উইলখানা একবার তাদের দেখাইয়াছিলাম। আমাকে আর উকিলবাড়ি হাঁটাহাঁটি করিতে হয় নাই।

এ পর্য্যন্ত বাড়ি হইতে বরাবর কিছু সাহায্য পাইয়াছি, সেটা বন্ধ হইয়াছে। আমরা দুইজনে মিলিয়া বিনা সহায়ে ঘর করিতে লাগিলাম সেই কষ্টেই আমাদের আনন্দ। আমার ছিল রায়চাঁদ প্রেমচাঁদের মার্কা—প্রোফেসারি সহজেই জুটিল। তার উপরে একজামিন-পাসের পেটেণ্ট ঔষধ বাহির করিলাম—পাঠ্যপুস্তকের মোটামোটা নোট। আমাদের অভাব অল্পই, এত করিবার দরকার

ছিল না। কিন্তু দামিনী বলিল, শচীশকে যেন তার জীবিকার জন্য ভাবিতে না হয় এটা আমাদের দেখা চাই। আর-একটা কথা দামিনী আমাকে বলিল না,—আমিও তাকে বলিলাম না, চুপিচুপি কাজটা সারিতে হইল। তার ভাইঝি দুটির সৎপাত্রে যাহাতে বিবাহ হয় এবং ভাইপো কয়টা পড়াশুনা করিয়া মানুষ হয় সেটা দেখিবার শক্তি দামিনীর ভাইদের ছিল না। তারা আমাদের ঘরে ঢুকিতে দেয় না—কিন্তু অর্থসাহায্য জিনিষটার জাতিকুল নাই, বিশেষত সেটাকে যখন গ্রহণমাত্র করাই দরকার, স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন।

কাজেই আমার অন্য কাজের উপর একটা ইংরেজি কাগজের সাব্-এডিটারি লইতে হইল। আমি দামিনীকে না বলিয়া একটা উড়ে বামুন, বেহারা এবং একটা চাকরের বন্দোবস্ত করিলাম। দামিনীও আমাকে না বলিয়া পরদিনেই সব-কটাকে বিদায় করিয়া দিল। আমি আপত্তি করিতেই সে বলিল, তোমরা কেবলি উল্টা বুঝিয়া দয়া কর। তুমি খাটিয়া হয়রান হইতেছ আর আমি যদি না খাটিতে পাই তবে আমার সে দুঃখ আর সে লজ্জা বহিবে কে?

বাহিরে আমার কাজ আর ভিতরে দামিনীর কাজ এই দুইয়ে যেন গঙ্গাযমুনার স্রোত মিলিয়া গেল। ইহার উপরে দামিনী পাড়ার ছোট ছোট মুসলমান মেয়েদের শেলাই শেখাইতে লাগিয়া গেল। কিছুতে সে আমার কাছে হার মানিবে না এই তার পণ।

কলিকাতার এই সহরটাই যে আমাদের দুজনের বৃন্দাবন, আর এই প্রাণপণ খাটুনিটাই যে আমাদের বাঁশির মোহন তান, এ কথাটাকে ঠিক সুরে বলিতে পারি এমন কবির শক্তি আমার

নাই। কিন্তু দিনগুলি যে গেল সে হাঁটিয়াও নয়, ছুটিয়াও নয়, একেবারে নাচিয়া চলিয়া গেল।

আরো একটা ফাল্গুন কাটিল। তারপরে আর কাটিল না।

সেবারে গুহা হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে দামিনীর বুকের মধ্যে একটা ব্যথা হইয়াছিল, সেই ব্যথার কথা সে কাহাকেও বলে নাই। যখন বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, এই ব্যথা আমার গোপন ঐশ্বর্য্য, এ আমার পরশমণি। এই কৌতুক লইয়া তবে আমি তোমার কাছে আসিতে পারিয়াছি, নহিলে আমি কি তোমার যোগ্য?

ডাক্তাররা এ ব্যামোর একেকজনা একো-রকমের নামকরণ করিতে লাগিল। তাদের কারো প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনের সঙ্গে কারো মিল হইল না। শেষকালে ভিজিট্ ও দাওয়াইখানার দেনার আগুনে আমার সঞ্চিত স্বর্ণটুকু ছাই করিয়া তারা লঙ্কাকাণ্ড সমাধা করিল এবং উত্তরকাণ্ডে মন্ত্রণা দিল হাওয়া বদল করিতে হইবে। তখন হাওয়া ছাড়া আমার আর বস্তু কিছুই বাকি ছিল না।

দামিনী বলিল, যেখান হইতে ব্যথা বহিয়া আনিয়াছি আমাকে সেই সমুদ্রের ধারে লইয়া যাও—সেখানে হাওয়ার অভাব নাই।

যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দুই নারী

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি।
একজনা, উর্ব্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনারাজ্যে রাণী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।

একজন তপোভঙ্গ করি'
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি'
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি,'
দু'হাতে ছড়ায় তা'রে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

আরজন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায় ;
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায় ;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্ব্বাদ পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্যসুধায় মধুর।
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবন-মৃত্যুর
পবিত্র সঙ্গমতীর্থতীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২০ মাঘ
পদ্মাতীর

কর্ম্মযজ্ঞ

(হিতসাধন-মণ্ডলীর প্রথম সভাধিবেশনে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম্ম।)

সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার জাতকর্ম্ম উৎসব করতে হয়; কিন্তু মানুষের কোনো শুভানুষ্ঠানের বেলায় আমরা এ নিয়ম পালন করি না—তার জন্মের পূর্ব্বে আশার সঞ্চারটুকু নিয়েই আমরা উৎসব করি। আজকের অনুষ্ঠানপত্রে লেখা আছে যে, হিতসাধন-মণ্ডলীর উদ্যোগে এ সভা আহূত, কিন্তু বস্তুত কোনো মণ্ডলী তো এখনো গড়া হয়নি—আজকের সভা কেবলমাত্র আশার আমন্ত্রণ নিয়ে এসেচে। তর্ক যুক্তি বিচার বিবেচনা সে সমস্ত পথে চলতে চলতে হবে—কিন্তু যাত্রার আরম্ভে পাথেয় সংগ্রহ করা চাই, আশাই ত সেই পাথেয়।

দীর্ঘকাল নৈরাশ্যের মধ্যে আমরা যাপন করেচি। অন্যান্য দেশের সৌভাগ্যের ইতিহাস আমাদের সাম্‌নে খোলা। তারা কেমন করে উন্নতির দিকে চলেচে সে সমস্তই আমাদের জানা। কিন্তু তার থেকে আমাদের মনে কোনো আশার সঞ্চার হয় নি; উল্টে আমরা জেনেছিলুম যে, যেহেতু তারা প্রবল তাই তারা প্রবল, যেহেতু আমরা দুর্ব্বল তাই আমরা দুর্ব্বল, এর আর নড়চড় নেই; এই বিশ্বাস অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে অবসাদে আমাদের অকর্ম্মণ্য করে তুলেচে। দেশ-জুড়ে কাজের ক্ষেত্র অথচ আমরা উদাসীন—তার কারণ এ নয় যে আমাদের স্বাভাবিক দেশপ্রীতি

নেই। বেদনায় বুক ভরে উঠেচে—তবু যে প্রতিকারের চেষ্টা করিনে তার একমাত্র কারণ, মনে আশা নেই।

কি পরিমাণ কাজ আমাদের সাম্‌নে আছে তার তালিকাটি আজ দেখা গেল, ভালোই হল। তারপরে দেশের মধ্যে কারা সেবক আছেন এবং তাঁরা কি রকম সাড়া দিলেন যদি জান্‌তে পারি সেও ভালো। কিন্তু সব চেয়ে যেটি বোঝা গেল সেটি হচ্চে এই যে, সমস্ত দেশের অন্তরের আশা আজ বাহিরে আকার গ্রহণের জন্য ব্যাকুল। সম্মুখে দুর্গম পথ। সেই পথের বাধা অতিক্রম করবার মত পাথেয় এবং উপায় এই নূতন উদ্যোগের আছে কি নেই, তা আমি জানি না। কিন্তু প্রাণের ভিতরে আশা বল্‌চে—না, মরব না, বাঁচ্‌বই এবং বাচাবই। এ আশা তো কোনো মতেই মরবার নয়, সে যে একেবারে প্রাণের মর্ম্মনিহিত। যদিচ মরবার লক্ষণই দেখচি—হিন্দুর জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, দুঃখ দুর্গতির ডালপালা বাড়চে, তবু প্রাণের ভিতরে আশা এই যে, বাঁচ্‌ব, বাঁচ্‌তেই হবে, কোনো মতেই মরব না।

জীবনের আরম্ভ বড় ক্ষীণ। যে-সব জিনিষ নির্জ্জীব, তাকে একমুহূর্ত্তেই ফরমায়েস মত ইঁট-কাঠ জোগাড় করে প্রকাণ্ড করে তোলা যেতে পারে, কিন্তু প্রাণের উপরে তো সে হুকুম চলে না। প্রাণ পরম দুর্ব্বলরূপেই আপনার প্রথম পরিচয় দিয়ে থাকে—সে ত অণু আকারেই দেখা দেয়, অথচ তারি মধ্যে অনন্তকালের সত্তা লুকিয়ে থাকে। অতএব আজ আমাদের আয়োজন কতটুকুই বা, ক'জন লোকেরি বা এতে উৎসাহ—এ সব কথা বলবার কথা নয়। কেননা বাইরের আয়োজন ছোট, অন্তরের আশা বড়।

আমরা কতবার এ রকম সভা সমিতির আয়োজন করেচি এবং কতবারই অকৃতার্থ হয়েচি—এ কথাও আলোচ্য নয়, ফিরে ফিরে যে এ রকম চেষ্টা নানা-আকারে দেখা দিয়েচে তার মানেই আমাদের আশা মরতে চায় না, তারো মানে প্রাণ আছে। প্রতিদিন আমাদের কত শুভচেষ্টা মরেচে এ কথা প্রত্যক্ষ হলেও কখনই সত্য নয়; সত্য এই যে শুভচেষ্টা মরে নি, এবং কোনো কালে মরতে পারে না। এক রাজার পর আর-এক রাজা মরে কিন্তু রাজার মৃত্যু নেই।

রামানন্দবাবু আমাদের সামনে কর্ত্তব্যের যে তালিকা উপস্থিত করেচেন, সে বৃহৎ। আমাদের সামর্থ্য যে কত অল্প তাতো আমরা জানি। যদি বাইরের হিসেব খতিয়ে দেখতে চাই, তাহ'লে কোনো ভরসা থাকে না। কিন্তু প্রাণের বে-হিসাবী আনন্দে সমস্ত অবসাদকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সেই আনন্দই হচ্চে শক্তি,—নিজের ভিতরকার সেই আনন্দময় শক্তির উপর আমাদের ভরসা রাখতে হবে। আপনার প্রতি আমাদের রাজভক্তি চাই। আমাদের অন্তরের মধ্যে যে রাজা আছেন, তাঁকে শ্রদ্ধা করি না বলেই তো তাঁর রাজত্ব তিনি চালাতে পারচেন না। তাঁর কাছে খাজানা নিয়ে এস, বল,—হুকুম কর তুমি, প্রাণ দেব তোমার কাজে, প্রাণ দিয়ে প্রাণ পাব।—আপনার প্রতি সেই রাজভক্তি প্রকাশ করবার দিন আজ উপস্থিত।

পৃথিবীর মহাপুরুষেরা জীবনের বাণী দিয়ে এই কথাই বলে গিয়েছেন যে বাইরের পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাকে বড় করে দেখোনা, অন্তরের মধ্যে যদি কণা-পরিমাণ শক্তি থাকে তার উপর শ্রদ্ধা রাখ। বিশ্বের

সব শক্তি আমার, কিন্তু আমার নিজের ভিতরকার শক্তি যতক্ষণ না জাগে ততক্ষণ শক্তির সঙ্গে শক্তির যোগ হয় না। পৃথিবীতে শক্তিই শক্তিকে পায়। বিশ্বের মধ্যে যে পরম শক্তি সমস্ত সৃষ্টির ভিতর দিয়ে, ইতিহাসের ভিতর দিয়ে আপনাকে বিচিত্ররূপে উদ্ঘাটিত করে সার্থক করে তুল্‌চেন, সেই শক্তিকে আপনার করতে না পারলে, সমস্ত জগতে এক শক্তিরূপে যিনি রয়েচেন তাঁকে সুস্পষ্টরূপে স্পর্শ করতে না পারলে, নৈরাশ্য আর যায় না, ভয় আর ঘোচে না। বিশ্বের শক্তি আমারই শক্তি এই কথা জানো। এই দুটো মাত্র ছোট চোখ দিয়ে লোক-লোকান্তরে উৎসারিত আলোকের প্রস্রবণ-ধারাকে গ্রহণ করতে পারচি তেম্‌নি আপন খণ্ড-শক্তিকে উন্মীলিত করবামাত্রই সকল মানুষের মধ্যে যে পরমাশক্তি আছে সেই শক্তি আমারই মধ্যে দেখব।

আমরা এতদিন পর্য্যন্ত নানা ব্যর্থ চেষ্টার মধ্য দিয়ে চলেছি। চেষ্টারূপে যে তার কোনো সফলতা নেই তা বল্‌ছি না। বস্তুত অবাধ সফলতায় মানুষকে দুর্ব্বল করে এবং ফলের মূল্য কমিয়ে দেয়। আমাদের দেশ যে হাত্‌ড়ে বেড়াচ্চে, গলা ভেঙে ডাকাডাকি করে মরচে, লক্ষ্যস্থানে গিয়ে পৌঁছে উঠতে পারচে না—এর জন্য নালিশ করব না। এই বারম্বার নিষ্ফলতার ভিতর দিয়েই আমাদের বের করতে হচ্চে, কোন্ জায়গায় আমাদের যথার্থ দুর্ব্বলতা। আমরা এটা দেখ্‌তে পেলাম যে যেখানেই আমরা নকল করতে গিয়েচি, সেইখানেই ব্যর্থ হয়েছি। যেসব দেশ বড় আকারে আমাদের সামনে রয়েছে সেখানকার কাজের রূপকে আমরা দেখেছি, কাজের উৎসকে তো দেখিনি।

তাই মনে কেবল আলোচনা করচি অন্য দেশ এই রকম করে অমুক বাণিজ্য করে, এই রকম আয়োজনে অমুক প্রতিষ্ঠান গড়ে, অন্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এত টাকাকড়ি, এত ঘরবাড়ি, এই নিয়ম ও পদ্ধতি,—আমাদের তা নেই—এই জন্যই আমরা মরছি। আমরা আলাদিনের প্রদীপের উপর বিশ্বাস করি, মনে করি যে, অন্য দেশের আয়োজনগুলোকে, সম্পদগুলোকে কোনো উপায়ে সশরীরে হাজির করলেই বুঝি আমরাও সৌভাগ্যশালী হয়ে উঠ্‌ব; কিন্তু জানিনা আলাদিনের প্রদীপ আস্ত জিনিষগুলো তুলে এনে কি ভয়ঙ্কর বোঝা আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দেবে—তখন তার ভার বইবে কে! বহিশ্চক্ষু মেলে অন্য দেশের কর্ম্মরূপকে আমরা দেখেছি, কিন্তু কর্ত্তাকে দেখিনি—কেননা নিজের ভিতরকার কর্ত্তৃ-শক্তিকে আমরা মেলতে পারিনি। কর্ম্মের বোঝাগুলোকে পরের কাছ থেকে ধার করে এনে বিপন্ন ও ব্যর্থ হতেই হবে, কর্ত্তাকে নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুল্‌তে পারলেই তখন কাজের উপকরণ খাঁটি, কাজের মূর্ত্তি সত্য ও কাজের ফল অমোঘ হবে।

আলাদিনের প্রদীপের ব্যাপার আমাদের এখানে অনেক দেখেছি সেইজন্যে এদেশে যে জিনিষটা গোড়াতেই বড় হয়ে দেখা দেয় তাকে বিশ্বাস করিনে। আমরা যেন আকৃতিটাকে চক্ষের পলকে যাদুকরের গাছের মত মস্ত করে তোলবার প্রলোভনকে মনে স্থান না দিই। সত্য আপন সত্যতার গৌরবেই ছোট হয়ে দেখা দিতে লজ্জিত হয় না। বড় আয়তনকে গ্রহণ করতে হলে সেটাকে মিথ্যার কাছ থেকে পাছে ধার নিতে হয় এই তার বিষম ভয়। লোকের চোখ ভোলাবার মোহে গোড়াতেই যদি মিথ্যার সঙ্গে তাকে যদি

করতে হয় তাহলে এক-রাত্রের মধ্যে যত বৃদ্ধিই তার হোক্ তিন-রাত্রের মধ্যে সে সমূলেন বিনশ্যতি। ঢাক-ঢোল বায়না দেবার পূর্ব্বে এবং কাঠ-খড়ু জোগাড়ের গোড়াতেই এ কথাটা যেন আমরা না ভুলি। যিনি পৃথিবীর একার্দ্ধকে ধর্ম্মের আশ্রয় দান করেছেন, তিনি আস্তাবলে নিরাশ্রয় দারিদ্র্যের কোলে জন্মেছিলেন। পৃথিবীতে যা কিছু বড় ও সার্থক, তার যে কত ছোট্ট জায়গায় জন্ম, কোন্ অজ্ঞাত লগ্নে যে তার সূত্রপাত, তা আমরা জানিনে —অনেক সময় মরে গিয়ে সে আপনার শক্তিকে প্রকাশমান করে। আমার এইটে বিশ্বাস যে, যে দরিদ্র সেই দারিদ্র্য জয় করবে—সেই বীরই সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের বাহিরে জীর্ণ কন্থার পরে জন্মগ্রহণ করেচে। যে সূতিকাগৃহের অন্ধকার কোণে জন্মেছে সেখানে আমরা প্রবেশ করে তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারিনি, কিন্তু সেখানকার শঙ্খধ্বনি বাইরের বাতাসকে স্পন্দিত করে তুলেছে। আমরা তাকে চক্ষে দেখলুম না কিন্তু আমাদের এই আনন্দ যে, তার অভ্যুদয় হয়েছে। আমাদের এই আনন্দ যে, আমরা তার সেবার অধিকারী।

আমরা জোড়হাত করে তাকিয়ে আছি, বল্‌ছি—তুমি এসেছ। তুমি অনেক দিনের প্রতীক্ষিত, অনেক দুঃখের ধন, তুমি বিধাতার কৃপা ভারতে অবতীর্ণ।

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা বলেছেন যে য়ুরোপে আজকাল কথা উঠেচে যে মানুষের উন্নতি সাধন ভালোবেসে নয়—বৈজ্ঞানিক নিয়মের জাঁতায় পিষে মানুষের উৎকর্ষ। অর্থাৎ যেন কেবল যন্ত্রে পুড়িয়ে-পিটিয়ে, কেটে-ছেঁটে, জুড়ে-তেড়ে মানুষকে তৈরি

করা যায়। এইজন্যেই মানুষের প্রাণ পীড়িত হয়ে উঠেচে। যন্ত্রকে প্রাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার মত দৌরাত্ম্য আর কিছুই হ'তে পারে না। তার পরিচয় বর্ত্তমান যুদ্ধে দেখতে পাচ্ছি। কলিযুগের কলদৈত্য স্বর্গের দেবতাদের নির্ব্বাসিত করে দিয়েছে, কিন্তু আবার তো স্বর্গকে ফিরে পেতে হবে। শিবের তৃতীয় নেত্র অগ্নি উদ্গিরণ না কর্‌লে কেমন করে সেই মঙ্গল ভূমিষ্ঠ হবে, যা দৈত্যের হাত থেকে স্বর্গকে উদ্ধার করবে?

কিন্তু আমাদের দেশে আমরা একেবারে উল্টো দিক্ থেকে মরঁচি —আমরা সয়তানের কর্ত্তৃত্বকে হঠাৎ প্রবল করতে গিয়ে মরিনি; আমরা মরচি ঔদাসীন্যে, আমরা মরচি জরায়। প্রাণের প্রতি প্রাণের যে সহজ ও প্রবল আকর্ষণ আছে, আমরা তা হারিয়েছি; আমরা পাশের লোককেও আত্মীয় বলে অনুভব করি না; পরিবার পরিজনের মধ্যেই প্রধানত আমাদের আনন্দ ও সহযোগিতা; সেই পরিধির বাইরে আমাদের চেতনা অস্পষ্ট। এই জন্যই আমাদের দেশে দুঃখ মৃত্যু অজ্ঞান দারিদ্র্য। তাই আমরা এবার যৌবনকে আহ্বান করচি। দেশের যৌবনের দ্বারে আমাদের আবেদন,—বাঁচাও, দেশকে তোমরা বাঁচাও। আমাদের ঔদাসীন্য বহুদিনের বহুযুগের; আমাদের প্রাণ-শক্তি আচ্ছন্ন আবৃত;—একে মুক্ত কর! কে করবে? দেশের যৌবন—যে যৌবন নূতনকে বিশ্বাস করতে পারে, প্রাণকে যে নিত্য অনুভব করতে পারে।

জরায় ব্যক্তিত্ব পঞ্চত্বে বিলীন হবার দিকে যায়। এই জন্য কোনো জায়গায় ব্যক্তিত্বের স্ফূর্ত্তি সে সইতে পারে না। ব্যক্তি মাত্রে প্রকাশ। চারিদিকে যেটা অব্যক্ত সেই বৃহৎ যখন একটা

কেন্দ্রকে আশ্রয় করে প্রকাশ পায়, তখনই ব্যক্তিত্ব। সঙ্কীর্ণের মধ্যে বিকীর্ণের ক্রিয়াশীলতাই ব্যক্তিত্ব।—আমাদের জাতীয় ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ আমাদের জাতির মধ্যে বিশ্বমানবের আবির্ভাব কেমন করে জাগবে?—দেবদানবকে সমুদ্র মন্থন করতে হয়েছিল তবে অমৃত জেগেছিল যে অমৃত সমস্তের মধ্যে ছড়ানো ছিল। কর্ম্মের মন্থন-দণ্ডের নিয়ত তাড়নায় তবেই আমাদের সকলের মধ্যে যে শক্তি ছড়িয়ে আছে তাকে আমরা ব্যক্ত আকারে পাব, তাতেই আমাদের জাতীয় ব্যক্তিত্ব অমর হয়ে উঠবে; আমাদের চিন্তা, বাক্য এবং কর্ম্ম সুনির্দ্দিষ্টতা পেতে থাকবে। ইংরাজিতে যাকে বলে Sentimentalism, সেই দুর্ব্বল অস্পষ্ট ভাবাতিশয্য আমাদের জীবনকে এতদিন জীর্ণ করেচে। কিন্তু এই ভাবাবেশের হাত-থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় কাজে প্রবৃত্ত হওয়া। কাজে লাগলেই তর্ককীটের আক্রমণ ও পাণ্ডিত্যের পণ্ডতা থেকে রক্ষা পাব।

সেই কর্ম্মের ক্ষেত্রে মিলনের জন্য আগ্রহবেগ দেশের ভিতরে জাগ্রত হয়েচে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দেশে আজ প্রচণ্ড শক্তি শিশুবেশে এসেচে। আমরা তা অন্তরে অনুভব করচি। যদি তা না অনুভব করি, তবে বৃথা জন্মেছি এই দেশে, বৃথা জন্মেছি এই কালে। এমন সময়ে এদেশে জন্মেছি যে-সময়ে আমরা একটা নূতন সৃষ্টির আরম্ভ দেখতে পাব। এ দেশের নব্য ইতিহাসের সেই প্রথম প্রত্যূষে যখন বিহঙ্গের কলকাকলিতে আকাশ ছেয়ে যায়নি, তখন আমরা জেগেচি। কিন্তু অরুণলেখা তো পূর্ব্ব-গগনে দেখা দিয়েচে—ভয় নেই, আমাদের ভয় নেই। মায়ের

পক্ষে তার সদ্যোজাত কুমারকে দেখবার আনন্দ যেমন তেমনি সৌভাগ্য, তেমনি আনন্দ আজ আমাদের। দেশে যখন বিধাতার আলোক অতিথি হয়ে এল, তখন আমরা চোখ মেললুম। এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, এই সৃজনের আরম্ভে, তাই প্রণাম করি তাঁকে যিনি আমাদের এই দেশে আহ্বান করেচেন—ভোগ করবার জন্য নয়, ত্যাগ করবার জন্য। আজ পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যশালী জাতিরা ঐশ্বর্য্য ভোগ করচে, কিন্তু তিনি আমাদের জন্ম দিয়েচেন জীর্ণ কন্থার উপরে—আমাদের তিনি ভার দিয়েচেন দুঃখ দারিদ্র্য দূর করবার। তিনি বলেচেন—অভাবের মধ্যে তোমাদের পাঠালুম, অজ্ঞানের মধ্যে পাঠালুম, অস্বাস্থ্যের মধ্যে পাঠালুম, তোমরা আমার বীরপুত্র সব। আমরা দরিদ্র বলেই নিজের সত্য শক্তিকে আমাদের নিতান্তই স্বীকার করতে হবে। আমরা যে এত স্তূপাকার অজ্ঞান রোগ দুঃখ দারিদ্র্য মুগ্ধসংস্কারের দুর্গদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা ছোট নই। আমরা বড়—এ কথা হবেই প্রকাশ—নইলে এ সঙ্কট আমাদের সাম্‌নে কেন? সেই কথা স্মরণ করে যিনি দুঃখ দিয়েছেন তাঁকে প্রণাম, যিনি অপমান দিয়েছেন তাঁকে প্রণাম, যিনি দারিদ্র্য দিয়েছেন তাঁকে প্রণাম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অভিভাষণ

(উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।)

আজ বাইশ বৎসর পূর্ব্বে, এই রাজসাহী সহরে, আমি সর্ব্বজনসমক্ষে সসঙ্কোচে ছুটি চারিটি কথা বলি। আমার জীবনে সেই সর্ব্বপ্রথম বক্তৃতা। কোনও দূর-ভবিষ্যতে আমি যে এই সভার মুখপাত্রস্বরূপে আবার আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইব—সে দিন একথা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

আজিকার ব্যাপারে যাঁহারা কর্ম্মকর্ত্তা, সেদিনও তাঁহারাই কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। মহারাজ নাটোর এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের উদ্যোগেই সে সভা আহূত হয়। এবং তাঁহাদের অনুরোধেই আমি সে সভার প্রধান-বক্তা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদানুসরণ করি। এ সভারও পতির আসন রবীন্দ্রনাথের জন্যই রচিত হইয়াছিল; তাঁহার অনুপস্থিতিতে, পূর্ব্বোক্ত বন্ধুদ্বয়ের অনুরোধে এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়-মত আমি তাঁহার ত্যক্ত এই রিক্ত আসন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। যাঁহারা আমাকে প্রথমে আসরে নামান, তাঁহারাই আজ আমাকে এ আসরের প্রধান নায়ক সাজাইয়া খাড়া করিয়াছেন। এ পদ অধিকার করিবার আমার কোনরূপ যোগ্যতা আছে কি না—সে বিচার তাঁহারাও করেন নাই, আমাকেও করিতে দেন নাই।

এ আসন গ্রহণ করিবার অধিকার যে আমার নাই—তাহা আমার নিকট অবিদিত নয়। আমি অবসরমত সাহিত্যচর্চ্চা করি,

কিন্তু সে গৃহকোণে এবং নির্জ্জনে। বক্তা ও লেখক একজাতীয় জীব নন;—ইঁহাদের পরস্পরের প্রকৃতিও ভিন্ন, রীতিও ভিন্ন। বক্তা চাহেন, তিনি শ্রোতার মন জবরদখল করেন, অপর-পক্ষে লেখক, পাঠকের মনের ভিতর অলক্ষিতে এবং ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে চাহেন। বক্তা শ্রোতার মনকে বিশ্রাম দেন না; লেখক পাঠকের অবসরের সাথী। অক্ষরের নীরবভাষায় একটি অদৃশ্য শ্রোতার কানে-কানে আমরা নানা ছলে নানা কথা বলিতে পারি—কিন্তু জনসমাজে আমাদের সহজেই বাক্‌রোধ হয়। যে বাণী সবুজপত্রের আবডালে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে তাহা সূর্য্যের নগ্ন কিরণের স্পর্শে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। অথচ গুণীসমাজে সুপরিচিত হইবার লোভও আমাদের পূরামাত্রায় আছে। সাহিত্যের রঙ্গভূমিতে দর্শকের নয়ন-মন আকর্ষণ করিবার জন্য আমরা নিত্য লালায়িত, অথচ লেখকের ভাগ্যে পাঠকের সাক্ষাৎ-কার-লাভ ক্বচিৎ ঘটে। প্রশংসার পুষ্পবৃষ্টি এবং নিন্দার শিলাবৃষ্টি উভয়ই আমাদের শিরোধার্য্য—একমাত্র উপেক্ষাই আমাদের নিকট চির-অসহ্য। সুতরাং সাহিত্য-সমাজে যথাযোগ্য আসন লাভ করাতেই আমরা কৃতার্থতা লাভ করি। দণ্ডী বলিয়াছেন যে—

"কৃশে কবিত্বেপি জনাঃ কৃতশ্রমা
বিদগ্ধগোষ্ঠীষু বিহর্তুমীশতে।"

আমাদের ন্যায় প্রতিভাবঞ্চিত লেখকদিগের সকল শ্রম বিদগ্ধ-গোষ্ঠীতে স্থানলাভ করাতেই সার্থক হয়। অতএব অন্য কারণাভাবেও অন্ততঃ দুদিনের জন্যও উত্তর-বঙ্গের বিদগ্ধগোষ্ঠীর গোষ্ঠী-পতি হইবার লোভ সম্ভবতঃ আমি সম্বরণ করিতে পারিতাম না।

(২)

কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার বিশেষ করিয়া একটি নিজস্ব কারণ আছে—যাহার দরুন আমি স্বেচ্ছায় এবং স্বচ্ছন্দ-চিত্তে এ আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি। এ স্থলে কোনরূপ বিনয়ের অভিনয় করা আমার অভিপ্রায় নয়। অযোগ্য ব্যক্তিকে উচ্চপদস্থ করা যে তাহাকে অপদস্থ করিবার অতি সহজ উপায়—এ জ্ঞান আমার আছে। এ সত্ত্বেও আমি যে আপনাদের সম্মুখে সশরীরে উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি তাহার কারণ উত্তর-বঙ্গের আহ্বান আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। আমার দেশ বলিতে আমি প্রথমতঃ এই প্রদেশই বুঝি। বারেন্দ্র সমাজের সহিত আমার নাড়ীর যোগ আছে, বরেন্দ্রভূমির প্রতি আমার রক্তের টান আছে। উত্তর-বঙ্গের প্রতি আমার অনুরাগকে এক-হিসাবে মৌলিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কেননা এই দেশের মাটিতেই এ দেহ গঠিত। আমার বিশ্বাস, বাস্তুভিটার প্রতি মানুষমাত্রেরই যে স্বাভাবিক টান আছে, সেই আদিম মনোভাবের অটল ভিত্তির উপরেই সভ্য মানবের স্বদেশ-বাৎসল্য প্রতিষ্ঠিত। অতীত-অনাগতের এই মিলন-ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের আত্মার সহিত আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচয় পাই। এই বাস্তু-প্রীতিই ক্রমে প্রসার লাভ করিয়া স্বদেশ-প্রীতিতে পরিণত হয়। সুতরাং যে দেশের যে ভূভাগ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের স্মৃতির সহিত একান্ত জড়িত, সে প্রদেশের প্রতি অন্তরের টান থাকা মানুষের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। আমার পারিবারিক পূর্ব্বকাহিনী এই বরেন্দ্রমণ্ডলের

চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ। সে সীমা লঙ্ঘন করিয়া আমার জাতীয় পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি, আর্য্যাবর্ত্ত দূরে থাক্, কান্যকুব্জেও গিয়া পৌঁছায় না। সুতরাং বরেন্দ্রভূমির প্রতি আমার যে প্রগাঢ় অনুরাগ আছে সে কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্তুত। এবং সেই মজ্জাগত প্রীতিবশতঃই, উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-পরিষদ যে গুরুভার আমার মস্তকে ন্যস্ত করিয়াছেন, আমি তাহা বিনা আপত্তিতে নত শিরে গ্রাহ্য করিয়াছি।

(৩)

এই প্রসঙ্গে আমি এইরূপ প্রাদেশিক সাহিত্য-সভার সার্থকতা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। কাহারও কাহারও মতে এইরূপ পৃথক পৃথক পরিষদের প্রতিষ্ঠায় সাহিত্য-সমাজেও প্রাদেশিকতার সৃষ্টি করা হয়। এ অভিযোগের অর্থ আমি অদ্যাবধি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। আমার বিশ্বাস, বাঙ্গলা দেশে এই জাতীয় সভা-সমিতির সংখ্যা যত বৃদ্ধিলাভ করিবে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। এবং আমার মতে এই সকল প্রাদেশিক সাহিত্য-সমিতির পক্ষে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। আমি শিক্ষা এবং সাহিত্য-সম্বন্ধে decentralisation-এর পক্ষপাতী। কোন-একটি আঢ্য পরিষদের শাসনাধীন থাকিলে প্রাদেশিক পরিষদ্‌গুলি সম্যক্ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে না। আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের প্রধান ত্রুটি তাহার বৈচিত্র্যের অভাব। বঙ্গদেশের সহিত বঙ্গ-সাহিত্যের সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটিলে এ অভাব দূর হইতে পারে। বঙ্গ-সাহিত্যে আমি দক্ষিণ-বঙ্গের প্রাধান্য অস্বীকার করি না। আমার বিশ্বাস,

এক ভাষার গুণে দক্ষিণবঙ্গ চিরকাল সে প্রাধান্য রক্ষা করিবে সুতরাং উত্তর-বঙ্গ এবং পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-পরিষদের প্রতি কোনরূপ কটাক্ষ-পাত করা কলিকাতার পক্ষে সঙ্গতও নহে; শোভনও নহে। বস্তুতঃ সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যের উপর নব-নাগরিক-সাহিত্যের প্রভাব এত বেশি যে, আমাদের প্রাদেশিক সাহিত্যে প্রাদেশিকতার নাম-গন্ধও থাকে না। এমন কি, কোনও হতভাগ্য লেখকের রচনা যদি নাগরিক মতে গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট বলিয়া গণ্য হয় তাহা হইলে সকল প্রদেশেই সে রচনা প্রাদেশিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়।

(৪)

উত্তর-বঙ্গের বিরুদ্ধে আর-একটি অভিযোগ এই যে, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতিকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত বরেন্দ্রমণ্ডলের পূর্ব্বগৌরবের নিদর্শন-সকলের বলে উত্তর-বঙ্গের মনে ঈষৎ অহংজ্ঞান জন্মলাভ করিয়াছে। এ কথা সত্য কি না তাহা আমি জানিনা। যদিই বা উত্তর-বঙ্গ তাহার অতীত-গৌরবে গৌরবান্বিত মনে করে তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সমগ্র বঙ্গের আত্মসম্মান রক্ষা করিতে হইলে প্রদেশ-মাত্রেরই অহঙ্কার সুপ্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ বলেন যে, কোনরূপ প্রদেশ-বাৎসল্যের প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, কেননা ঐরূপ সঙ্কীর্ণ মনোভাব উদার স্বদেশ-বাৎসল্যের প্রতিবন্ধক। আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতেই আপনারা অনুমান করিতে পারেন যে, ইঁহারা যে মনোভাবকে সঙ্কীর্ণ বলেন, আমি তাহাকেই প্রকৃত উদার মনোভাবের ভিত্তি-স্বরূপ জ্ঞান করি। যে স্থলে কোন অংশের প্রতি প্রীতি নাই,

সেস্থলে সমগ্রের প্রতি ভক্তির মূল কোথায় তাহা আমি খুঁজিয়া পাই না।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে, যে মনোভাবকে অতি উদার বলা হয় তাহার কোনরূপ ভিত্তি নাই। বাঙ্গলাদেশের সহিত, বাঙ্গলার ইতিহাসের সহিত, বঙ্গ-সাহিত্যের সহিত কিছুমাত্র পরিচয় নাই অথচ বঙ্গমাতার নামে মুগ্ধ এইরূপ লোক আমাদের শিক্ষিত সমাজে বিরল নহে। রাজনীতির ক্ষেত্রে ইঁহাদের প্রতাপ দুর্দ্দান্ত এবং প্রতিপত্তি অসীম। এইরূপ উদার মনোভাবের অবলম্বন কোন বস্তুবিশেষ নয়,—কিন্তু একটি নামমাত্র। এইরূপ স্বদেশ-প্রীতির মূল—হৃদয়ে নয়, মস্তিষ্কে। এইরূপ স্বদেশী মনোভাব বিদেশী পুস্তক হইতে সংগৃহীত। এইরূপ পুঁথিজাত এবং পুঁতিগত পেট্রিয়টিজমের সাহায্যে রাষ্ট্রগঠন করা যায় কি যায় না তাহা আমার অবিদিত কিন্তু সাহিত্য যে সৃষ্টি করা যায় না সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। নামের মাহাত্ম্য আমি অস্বীকার করি না। স্বদলবলে উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে মানুষে দশাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ঐরূপ ক্ষণিক উত্তেজনার প্রসাদে পৃথিবীর কোন কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না। সিদ্ধি সাধনার অপেক্ষা রাখে এবং সাধনা স্থিরবুদ্ধির অপেক্ষা রাখে। সুতরাং তথাকথিত সঙ্কীর্ণ প্রদেশ-বাৎসল্য যদি এই জাতীয় উদার মনোভাবের বিরোধী হয়, তাহা হইলে এইরূপ সঙ্কীর্ণ মনোভাবের চর্চ্চা করা আমি একান্ত শ্রেয়ঃ মনে করি। কিন্তু আসলে এ সকল অভিযোগের মূলে কোনও সত্য নাই। কেননা একমাত্র সাহিত্যই এ পৃথিবীতে মানব-মনের সকলপ্রকার সঙ্কীর্ণতার জাত-শত্রু। জ্ঞানের প্রদীপ যেখানেই

জ্বালো না কেন, তাহার আলোক চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে; ভাবের ফুল যেখানেই ফুটুক না কেন, তাহার গন্ধ দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। মনোজগতে বাতি জ্বালানো এবং ফুল ফোটানোই সাহিত্যের একমাত্র ধর্ম্ম এবং একমাত্র কর্ম্ম। কোনও জাতির মনের ঐক্য-সাধনের প্রধান উপায় সাহিত্য; কেননা ভাষার ঐক্যই জাতীয় ঐক্যের মূল। ভারতবর্ষ একটি ভৌগলিক সংজ্ঞামাত্র হইতে পারে কিন্তু বাঙ্গালী যে একটি বিশিষ্ট জাতি তাহার কারণ—এক-ভাষার বন্ধনে এ দেশের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান সকলেই আবদ্ধ। সকলপ্রকার স্বার্থের বন্ধনের অপেক্ষা ভাষার বন্ধন দৃঢ়। এ বন্ধন ছিন্ন করিবার শক্তি কাহারও নাই, কেননা ভাষা অশরীরী। শব্দ বহির্জ্জগতে ক্ষণস্থায়ী কিন্তু মনোজগতে চিরস্থায়ী। এই চিরস্থায়ী ভিত্তির উপরই আমরা সরস্বতীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করি।

(৫)

যে সভার বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি সেই সভাতে এই রাজসাহী সহরে রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেন যে, আমাদের স্কুল-কলেজে বঙ্গভাষার সম্যক চর্চ্চা হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য এবং আমি সে প্রস্তাবের সমর্থন করি। বঙ্গসন্তানের শিক্ষা যতদূর সম্ভব বঙ্গভাষাতেই হওয়া সঙ্গত—এরূপ প্রস্তাব সে যুগের শিক্ষিত লোকদের মনঃপূত হয় নাই। এ প্রস্তাব শুনিয়া অনেকে হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই,—অনেকে আবার অসম্ভবরূপ বিরক্তও হইয়াছিলেন। এ প্রস্তাবের প্রতি যে সেকালে কতদূর অবজ্ঞা

দেখানো হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ, প্রকাশ্যে কেহ এ কথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাও আবশ্যক মনে করেন নাই। কবির কবিত্ব এবং বিদূষকের ভাঁড়ামি সুবুদ্ধি চিরকালই হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। আজ মাতৃভাষার চর্চ্চা করিতে বলিলে কাহারও ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না, কেননা ইতিমধ্যে সে ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক-কোণে একটুখানি স্থানলাভ করিয়াছে। এমন কি, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পাষাণমূর্ত্তির পাদপীঠে এই শিলালিপি উৎকীর্ণ করা হইয়াছে—তাঁহার যত্ন এবং তাঁহার চেষ্টায় The mother's tongue has been put in the step-mother's hall—অর্থাৎ বিমাতার আলয়ে মাতার রসনা স্থাপিত হইয়াছে। দেশসুদ্ধ লোক ইহা গৌরবের কথা মনে করিতেছেন। কিন্তু বিমাতার মন্দিরে মাতৃভাষা যে অদ্যাপিও যথাযোগ্য স্থান লাভ করেন নাই—ঐ বিমাতৃভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপিই তাহার পরিচয়। এবং উক্ত লিপি ইহাও প্রমাণ করিতেছে যে, ভাষাসম্বন্ধেও আত্মবশ হওয়াই সুখের এবং পরবশ হওয়াই দুঃখের কারণ। সত্যকথা এই যে—মাতৃভাষার সাহায্যেই আমরা যথার্থ ভাষাজ্ঞান লাভ করি এবং সে জ্ঞানের অভাবে আমরা পরভাষাও যথার্থরূপে আয়ত্ত করিতে পারি না। যেদিন আমাদের সকল বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা প্রাধান্য লাভ করিবে এবং ইংরাজী ভাষা দ্বিতীয় আসন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে সেইদিন বঙ্গসন্তান যথার্থ শিক্ষালাভের অধিকারী হইবে।

একদিন যেমন বাঙ্গলা পড়িতে বলিলে অনেকে মনে প্রমাদ গণিতেন—আজ তেমনি বাঙ্গলা লিখিতে বলিলে অনেকে মনে

প্রমাদ গণেন। সেকালে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, আমরা নব-শিক্ষার আভিজাত্য নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছি; একালে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, আমরা নব-সাহিত্যের আভিজাত্য নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমাদের জাতীয় ভাষা যে এত হেয় যে তাহার স্পর্শে আমাদের শিক্ষাদীক্ষা সব মলিন হইয়া যায়—এ কথা বলায় বাঙ্গালী অবশ্য তাঁহার আভিজাত্যের পরিচয় দেন না,—পরিচয় দেন শুধু তাঁহার বিজাতীয় নব-শিক্ষার। যে কারণেই হউক, অনেকে যে মাতৃভাষার পক্ষপাতী নহেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমি এই উপলক্ষ্যেই পাইয়াছি। যেদিন আমি এই সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হই সেদিন আমার কোন শুভার্থী বন্ধু আমাকে সতর্ক করিয়া দেন যে—এ সভাস্থলে "বীরবলী ঢং চল্‌বে না!" যে-কোন সভাতেই হউক না কেন, বিদূষকের আসন যে সভাপতির আসনের বহু নিম্নে সে স্থান কে আমার আছে তাহা অবশ্য আমার বন্ধুর অবিদিত ছিল না। অপর-পক্ষে আমার উপর তাঁহার এ ভরসাটুকুও ছিল যে, এই সুযোগে আমি এই উচ্চ আসন হইতে সভার গাত্রে বীরবলিক অ্যাসিড নিক্ষেপ করিব না। আসলে তিনি এ ক্ষেত্রে আমাকে বীরবলের ভাষা ত্যাগ করিতেই পরামর্শ দিয়াছিলেন—কেননা সে ভাষা অটপহুরে;—পোষাকি নয়। সভ্য সমাজে উপস্থিত হইতে হইলে সমাজ-সম্মত ভদ্রবেশ ধারণ করাই সঙ্গত—ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে সে বেশ যতই অনভ্যস্ত হউক না কেন। আমি তাঁহার পরামর্শ-অনুসারে 'পররুচি পরিধান'—এই বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া এ যাত্রা সাধুভাষাই অঙ্গীকার করিয়াছি। কেননা সাধু-

ভাষা যে ধোপদুরস্ত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইহাতে একটুও রং নাই এবং অনেকখানি মাড় আছে, ফলে ইহা স্বতঃই ফুলিয়াও উঠে এবং খড়খড়ও করে। আশা করি, এ সন্দেহ কেহ করিবেন না যে, এই বেশ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার মতেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সময়োচিত বেশ ধারণ করা—আমাদের সমাজের সনাতন প্রথা। আমরা কৈশোরের প্রারম্ভে অন্ততঃ তিন দিনের জন্যও কর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল এবং দেহে গৈরিক বসন ধারণ করিয়া, মুণ্ডিত-মস্তকে, ঝুলি-স্কন্ধে, দণ্ড-হস্তে, নগ্ন-পদে ভিক্ষা মাগি। এই আমাদের প্রথম সংস্কার। তাহার পর যৌবনের প্রারম্ভে অন্ততঃ এক দিনের জন্যও আমরা রাজবেশ ধারণ করিয়া তকৃত-রাঙ্গায় চড়িয়া ঢাক-ঢোল বাজাইয়া পাত্রমিত্রসমভিব্যাহারে কন্যার গৃহাভিমুখে রণযাত্রা করি। ইহাই আমাদের দ্বিতীয় সংস্কার। আমরা যখন রাজাও সাজিতে, ব্রহ্মচারীও সাজিতে জানি—তখন সভ্য সাজা ত আমাদের পক্ষে অতি সহজ। জীবনে সভ্যতার সাজ খোলাই কঠিন,—পরা কঠিন নয়।

(৬)

ভাষা সাহিত্যের মূল-উপাদান—সুতরাং সাহিত্য-পরিষদে ভাষা-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। লেখকেরা ভাষার সৌন্দর্য্যের দ্বারাই পাঠকের মনোরঞ্জন করেন এবং ভাষার শক্তির দ্বারাই পাঠকের মন হরণ করেন। সুতরাং কোনও লেখক আর সাধ করিয়া শ্রীহীন এবং শক্তিহীন ভাষা ব্যবহার করেন না। আমরা যে লেখায় মৌখিক ভাষার পক্ষপাতী তাহার কারণ আমাদের বিশ্বাস, আমাদের মাতৃভাষা রূপে যৌবনে তথাকথিত

সাধুভাষা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য-কথা আমি নানা সময়ে, নানা স্থানে, নানা ভাবে প্রকাশ করিয়াছি;—আত্মমত সমর্থনের জন্য কখনও বা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, বিরুদ্ধমত খণ্ডনের জন্য কখনও বা তাহার উপর বিদ্রুপ-বাণ বর্ষণ করিয়াছি। এ স্থলে সে সকল কথার পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কেননা পুনরুক্তি ওকালতিতে যে-পরিমাণে সার্থক, সাহিত্যে সেই পরিমাণে নিরর্থক।

আপাততঃ আমি যতদূরসম্ভব সংক্ষেপে এই সাধুভাষার জন্ম-বৃত্তান্তের পরিচয় দিতেছি, তাহা হইতেই আপনারা অনুমান করিতে পারিবেন যে, ইহার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার চেষ্টা কেবল মাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা কি আর-কিছু।

বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্য আছে—কিন্তু সে সাহিত্য পদ্যে রচিত, গদ্যে নয়। আজ প্রায় একশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের গদ্য-সাহিত্য জন্মলাভ করে—এবং সাধুতা এই সাহিত্যেরই ধর্ম্ম। শতবর্ষ পরমায়ু—বিধির এই নিয়মানুসারে এ সাহিত্যের এখন পরিণত দেহ ত্যাগ করিয়া নবকলেবর ধারণ করা উচিত।

সে যাহা হউক, এ সাহিত্য জাতীয় মন হইতে গড়িয়া উঠে নাই;—ইংরাজ রাজপুরুষদের ফরমায়েসে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক নিতান্ত অযত্নে ইহা গঠিত হইয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার কালের হিসাব এবং ক্ষমতার হিসাব,—দুই হিসাবেই এই শ্রেণীর লেখক-দিগের অগ্রগণ্য। তাঁহার রচিত প্রবোধচন্দ্রিকা ১৮১০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রবোধচন্দ্রিকায়াং প্রথমস্তবকে মুখবন্ধে ভাষাপ্রশংসানাম প্রথমকুসুমের শেষাংশে লিখিত আছে যে—

"গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে কোন পণ্ডিত প্রবোধ-চন্দ্রিকা নামে গ্রন্থ রচিতেছেন—'

বঙ্গভাষাসম্বন্ধে তর্কালঙ্কারমহাশয়ের ধারণা কিরূপ ছিল তাহার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়াছেন—

"অস্মদাদির ভাষার যুগপৎ বৈখরীরূপতামাত্র প্রতীতি সে উচ্চারণক্রিয়ার অতিশীঘ্রতাপ্রযুক্ত উপর্যধোভাবাবস্থিত কোমলতর-বহুল-কমলদল সূচীবেধন ক্রিয়ার মত। এতদ্রূপে প্রবর্ত্তমান সকল ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষা উত্তমা, বহুবর্ণময়ত্বপ্রযুক্ত একদ্ব্যক্ষর পশুপক্ষিভাষা হইতে বহুতরাক্ষর মনুষ্যভাষার মত ইত্যনুমানে সংস্কৃত ভাষা সর্ব্বোত্তমা ইহা নিশ্চয়—"

উক্ত ভাষা যে অস্মদাদির ভাষা নহে—তাহা বলা বাহুল্য। এবং এই ভাষায় অভিনব যুবক সাহেবজাতেরা যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে কোনই দুঃখ নাই—কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, অভিনব যুবক বঙ্গজাতেরাও যুগে যুগে এইরূপ ভাষা উত্তমা ভাষা হিসাবে শিক্ষা করিয়াছেন। কেননা এই রচনাই সাধুভাষার প্রথম সংস্করণ, এবং বিলাতি ছাপাখানার ছাপমারা এই ভাষাই কালক্রমে অল্পবিস্তর রূপান্তরিত হইয়া আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত হইয়াছে। ইহার জন্য মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারপ্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলীকে আমি দোষী করি না; তাঁহাদের বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা করিবার কোনরূপ অভিপ্রায় ছিল না—কেননা দেশীভাষায় যে কোনরূপ শাস্ত্র রচিত হইতে পারে, ইহা তাঁহাদের ধারণার বহির্ভূত ছিল।

ফলতঃ এ সকল তর্কালঙ্কারমহাশয়ের নিজের রচনা নহে। দণ্ডীর কাব্যাদর্শপ্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত পদ্যকে ছন্দমুক্ত এবং বিভক্তিচ্যুত করিয়া তর্কালঙ্কারমহাশয় এই কিম্ভূতকিমাকার গদ্যের

সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইরূপ রচনায় কোনরূপ যত্ন, কোন রূপ পরিশ্রমের লেশমাত্রও নিদর্শন নাই। তর্কালঙ্কারমহাশয় নিজে কখনই এরূপ রচনাকে গদ্যের আদর্শ মনে করেন নাই। সংস্কৃত পদ্যের ছন্দপাত করিলে তাহা যে বাঙ্গলা গদ্যে পরিণত হয়, এরূপ ধারণা যে তাঁহার মনে ছিল একথা বিশ্বাস করা কঠিন। কেননা তিনি একদিকে যেমন সাধুভাষার আদি-লেখক—অপর-দিকেও তিনি তেমনি চলতি-ভাষারও আদর্শ লেখক। নিম্নে তাঁহার চলতি-ভাষায় নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"মোরা চাষ করিব, ফসল পাবো, রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে, তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাব, ছেলেপিলাগুলিন পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয়, সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি, কেবল উড়িধানের মুড়ি ও মটর মসুর শাক পাতা শামুক গুগুলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি। খড় কুটাকাটা শুকনাপাতা বঞ্চী তুষ ও বিলঘটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি, কাপাস তুলি, তুলা করি, ফুঁড়ী পিঁজী পাঁইজ করি, চরকাতে সূতা কাটি, কাপড় বুনাইয়া পরি। আপনি মাঠে ঘাটে বেড়াইয়া ফলফুলারিটা যা পাই তাহা হাটে বাজারে মাথায় মোট করিয়া লইয়া গিয়া বেচিয়া পণেক দশ গণ্ডা যা পাই ও মিনসা পাড়াপড়সিদের ঘরে মুনিস খাটিয়া দুই চারিপণ যাহা পায়, তাহাতে তাঁতির বাণী দি, ও তেল লুন করি, কাটনা কাটি, ভাড়া ভানি, ধান কুড়াই শিজাই শুকাই ভানি, খুদকুঁড়া ফেন আমানি খাই। যে দিন শাক ভাত খাইতে পাই সে দিন ত অম্মতিথি। শীতের দিনে কাঁথাখানি ছালিয়াগুলিকের গায় দি। আপনারা দুই প্রাণী বিচালি বিছাইয়া পোয়ালের বিড়ায় মাতা দিয়া মেলের মাদুর গায়ে দিয়া শুই। বাসন গহনা কখন চক্ষেও দেখিতে পাই না। যদি কখন শাখরায় খাইতে পাই ও রাঙ্গা তালের পাতা কাণে পরিতে ও পুতির মালা

গলায় পরিতে ও রাঙ্গ শিশা পিতলের বালা তাড়মল খাড়ু গায়ে পরিতে পাই তবে ত রাজরাণী হই। এ দুঃখেও দুরন্ত রাজা, হাজা শুকা হইলেও আপন রাজত্বের কড়া গণ্ডা ক্রান্তি বট ধূল ছাড়েনা। এক আধ দিন আগে পিছে সহেনা। যত্তপিস্যাৎ কখন হয় তবে তার সুদ দাম দাম বুঝিয়া লয়, কড়াকপর্দ্দকও ছাড়ে না। যদি দিবার যোত্র না হয়, তবে সোনামোড়ল পাটোয়ারি ইজারাদার তালুকদার জমীদারেরা পাইক পেয়াদা পাঠাইয়া হাল যোয়াল ফাল হালিয়াবলদ দামড়াগরু বাছুর বকনা কাঁথা পাথর চুপড়ী কুলা ধুচুনী পর্য্যন্ত বেচিয়া গোবাড়ীয়া করিয়া পিটিয়া সর্ব্বস্ব লয়। মহাজনের দশগুণ সুদ দিয়াও মূল আদায় করিতে পারি না, কত বা সাধ্যসাধনা করি—হাতে ধরি পায়ে পড়ি হাত জুড়ি দাঁতে কুটা করি। হে ঈশ্বর দুঃখির উপরেই দুঃখ। ওরে পোড়া বিধাতা আমাদের কপালে এত দুঃখ লিখিস। তোর কি ভাতের পাতে আমরাই ছাই দিয়াছি?"

এ ভাষা অস্মদীয় ভাষা হউক আর না হউক, ইহা যে খাঁটি বাঙ্গলা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ ভাষা সজীব সতেজ সরল স্বচ্ছন্দ ও সরস। ইহার গতি মুক্ত;—ইহার শরীরের লেশমাত্রও জড়তা নাই। এবং এ ভাষা যে সাহিত্য-রচনার উপযোগী উপরোক্ত নমুনাই তাহার প্রমাণ। এই ভাষার গুণেই তর্কালঙ্কারমহাশয়ের রচিত পল্লিচিত্র পাঠকের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। এ বর্ণনাটি সাধুভাষায় অনুবাদ কর,—ছবিটি অস্পষ্ট হইয়া যাইবে। অপরপক্ষে তর্কালঙ্কারমহাশয়ের ভাষাসম্বন্ধে পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তিটি ভাষায় অনুবাদ কর—তাঁহার বক্তব্য কথা সুস্পষ্ট হইয়া আসিবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকেরা যদি তর্কালঙ্কারমহাশয়ের রচনার এই বঙ্গীয় রীতি অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে কালক্রমে

এই ভাষা সুসংস্কৃত এবং পুষ্ট হইয়া আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিত। কিন্তু তাঁহারা তর্কালঙ্কারমহাশয়ের গৌড়ীয়-রীতিকেই গ্রাহ্য করিয়া তাহাকে সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পণ্ডিতগণের ত্যক্ত দায় আমরা উত্তরাধিকারী-সত্বে লাভ করিয়া অদ্যাপি তাহাই ভোগদখল করিয়া আসিতেছি। প্রবোধচন্দ্রিকার তৃতীয় স্তবকের কুসুমগুলি মেঠো হইলেও স্বদেশী ফুল। আর প্রথম স্তবকের কুসুমগুলি শুধু কাগজের নয়, তুলোট কাগজের ফুল। আবাদ করিতে জানিলে কাঠ-গোলাপ বসরাই-গোলাপে পরিণত হয়। কিন্তু কালের কবলে ছিন্ন ভিন্ন বিবর্ণ হওয়া ব্যতীত কাগজের ফুলের গত্যন্তর নাই।

(৭)

কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, এই দুই ভাষার মিলন-সূত্রেই বর্ত্তমান সাধুভাষা জন্মলাভ করিয়াছে—কিন্তু আমার ধারণা অন্যরূপ। বর্ণে ও গঠনে এই দুই ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক-জাতীয় সুতরাং ইহাদের যোগাযোগে কোনরূপ নূতন পদার্থের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। বহুকালযাবৎ এ দুই পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই চর্চ্চা করা হইয়াছিল। একের পরিণতি কালীসিংহমহাশয়ের মহাভারতে, অপরের পরিণতি তাঁহার হুতুম পেঁচার নক্সায়। ইহার কারণও স্পষ্ট। হুতোমি ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করা মূর্খতা এবং মহাভারতের ভাষায় সামাজিক নক্সা রচনা করা ছদ্মতামাত্র।

যে ভাষা আসলে এক, জোর করিয়া তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এই দুই ভাষা রচিত হয়। সে ভাঙ্গা জোড়া লাগাইবার

চেষ্টা বৃথা। আমাদের মৌখিক ভাষা নিছক চাষার ভাষাও নহে, নিটোল সংস্কৃতও নহে। আমাদের মুখের ভাষায়—বহু তৎসম শব্দ এবং বহু তদ্ভব শব্দ আছে। দেশীয় শব্দও যে নাই তাহা নহে, তবে তাহাদের সংখ্যা এত অল্প যে নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হয় তৎসম, নয় তদ্ভব শব্দ বর্জ্জন করিয়া বাঙ্গলা লেখার অর্থ ভাষার উপর অত্যাচার করা,—অকারণে অযথারূপে তাহাকে হয় স্ফীত করিয়া তোলা, নয় শীর্ণ করিয়া ফেলা। সুতরাং এ দুই পথের ভিতর কোনও মধ্যপথ রচনা করিবার কোনও আবশ্যকতা ছিল না—কেননা সে মধ্যপথ ত চিরকালই আমাদের মুখস্থ ছিল। বঙ্গভাষা সংস্কৃতের ভার কতদূর সয়, মৌখিক ভাষার প্রতি কর্ণপাত করিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এ জ্ঞান আর কাহারও থাক আর নাই থাক, রামমোহন রায়ের ছিল।

(৮)

তিনি তাঁহার বেদান্তগ্রন্থের অনুষ্ঠানে লিখিয়াছেন যে—

"প্রথমতঃ বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপারের নির্ব্বাহযোগ্য কেবল কতকগুলিন শব্দ আছে। এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে, দ্বিতীয়তঃ এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিংবা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের (Sentence) গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয়। অতএব বেদান্তশাস্ত্রের ভাষায় বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের

প্রকরণ লিখিতেছি। যাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর যাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধুভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক।"

সকল দেশেই শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের কথোপকথনের ভাষার যে ঐশ্বর্য্য আছে অশিক্ষিত-সম্প্রদায়ের ভাষার তাহা নাই। সমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেরা ধনে ও মনে সমান দরিদ্র। তাহাদের জ্ঞান নিতান্ত সীমাবদ্ধ এবং ভাষাও সঙ্কীর্ণ। যদি ভদ্র-সমাজের মৌখিক ভাষা সাধুভাষা হয়—তাহা হইলে সাধুভাষাই সাহিত্যের একমাত্র উপযোগী ভাষা। এস্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে—লৌকিক-ভাষা এই সাধুভাষার অন্তর্ভূত, বহির্ভূত নয়। রামমোহন রায় যাহাকে গৃহব্যাপারে নির্ব্বাহযোগ্য শব্দ বলেন সেই শব্দসমূহই সকল ভাষার মূলধন।

রামমোহন রায় বলিয়াছেন যে, এ ভাষা সংস্কৃতের অধীন। এ কথাও আমরা মানিতে বাধ্য। কিন্তু সে অধীনতা অভিধানের অধীনতা, ব্যাকরণের নয়—এই সত্যটি মনে রাখিলে ব্যাকরণ আমাদের নিকট বিভীষিকা হইয়া দাঁড়ায় না। ভাষার স্বাতন্ত্র্য যে তাহার গঠনের উপর নির্ভর করে—এ সত্য রামমোহন রায়ের নিকট অবিদিত ছিল না। তাঁহার মতে—

"ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় শব্দের বর্ণগত নিয়ম ও বৈলক্ষণ্যের প্রণালী ও অন্বয়ের রীতি যে গ্রন্থের অভিধেয় হয়—তাহাকে সেই সেই দেশীয় ভাষার ব্যাকরণ কহা যায়।"

অতএব এক ভাষা অপর-ভাষার ব্যাকরণের অধীন হইতে পারে না।

আমরা যখন দৈনিক জীবনের অন্নবস্ত্রের, সুখদুঃখের অতিরিক্ত কোন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই তখন সংস্কৃত অভিধানের আশ্রয় লওয়া ব্যতীত আমাদের উপায়ান্তর নাই। নানা ভাষার মধ্যে শব্দের পরস্পর আদান-প্রদান আবহমান-কাল সভ্য-সমাজে চলিয়া আসিতেছে। আবশ্যক-মত ঐরূপ শব্দ আত্মসাৎ করায় ভাষার কান্তি পুষ্ট হয়—স্বরূপ নষ্ট হয় না। নিতান্ত বাধ্য না হইলে এ কাজ করা উচিত নয়,—কেননা পর-ভাষার শব্দ আহরণ কিম্বা হরণ করা সর্ব্বত্র নিরাপদ নহে। শব্দের আভিধানিক অর্থ তাহার সম্পূর্ণ অর্থ নয়, আভিধানিক অর্থে ভাবের আকার থাকিলেও তাহার ইঙ্গিত থাকে না। লৌকিক-শব্দের আদ্যোপান্ত বর্জ্জন এবং অপর ভাষার অন্বয়ের অনুকরণেই ভাষার জাতি নষ্ট হয়। মৌখিক ভাষার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিবার যো নাই। সুতরাং শিক্ষিত লোকের সকল অত্যাচার লিখিত-ভাষাকেই নীরবে সহ্য করিতে হয়।

রামমোহন রায় যে মৌখিক ভাষার উপরেই তাঁহার রচনার ভাষা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ, তাঁহার ব্যবহৃত পদ-সকল অবৈধসন্ধিবদ্ধ কিম্বা সমাসবিড়ম্বিত নহে। তিনি জানিতেন যে, "সংস্কৃত সন্ধিপ্রকরণ ভাষায় উপস্থিত করিলে তাবৎ গুণদায়ক না হইয়া বরঞ্চ আক্ষেপের কারণ হয়।" সমাসসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, "এরূপ পদ গৌড়ীয় ভাষাতে বাহুল্যমতে ব্যবহারে আসে না।" তাঁহার মতে "হাতভাঙ্গা" "গাছ-পাকা" প্রভৃতি পদই বাঙ্গলা-সমাসের উদাহরণ। তাঁহার পরবর্ত্তী লেখকেরা যদি এই সত্যটি বিস্মৃত না হইতেন তবে তাঁহারা বাঙ্গলা সাহিত্যকে সংস্কৃতের

জাগ দিয়া পাকাইতে চাহিতেন না—এবং হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া দাঁতভাঙ্গা সমাসের সৃষ্টি করিতেন না। তিনি মৌখিক ভাষার সহজ সাধুত্ব গ্রাহ্য করিয়াছিলেন বলিয়া বানান-সমস্যারও অতি সহজ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে খাঁটি সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃতরীতি-অনুসারেই লিখিত হওয়া কর্ত্তব্য এবং তদ্ভব ও দেশীয় শব্দের বানান তাহার উচ্চারণের অনুরূপ হওয়া কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যে স্থলে শ্রুতিতে স্মৃতিতে বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে সংস্কৃত শব্দসম্বন্ধে স্মৃতি মান্য এবং বাঙ্গলা শব্দসম্বন্ধে শ্রুতি মান্য। রামমোহন রায় বঙ্গসাহিত্যের যে সহজ পথ অবলম্বন করিয়া ছিলেন সকলে যদি সেই পথের পথিক হইতেন তাহা হইলে আমাদের কোনরূপ আক্ষেপের কারণ থাকিত না।

কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত রীতি যে বঙ্গসাহিত্যে গ্রাহ্য হয় নাই তাহার প্রধান কারণ, তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদিগের রচনা-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। এ গদ্য, আমরা যাহাকে modern prose বলি, তাহা নয়। পদে পদে পূর্ব্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়। সুতরাং আমাদের দেশে ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যে পণ্ডিতি যুগের অবসান হইল এবং ইংরাজি যুগের সূত্রপাত হইল। ইংরাজি সাহিত্যের আদর্শেই আমরা বঙ্গ-সাহিত্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। Milton না পড়িলে বাঙ্গালী মেঘনাদবধ লিখিত না, Scott না পড়িলে দুর্গেশনন্দিনী লিখিত না এবং Byron না পড়িলে পলাশীর যুদ্ধ লিখিত না। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্য ইংরাজি সাহিত্যের একান্ত অধীন

হইয়া পড়িল—ফলে বঙ্গসাহিত্য তাহার স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ আবার হারাইয়া বসিল। এই ইংরাজি-নবিস লেখকদিগের হস্তে বঙ্গভাষা এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল। সংস্কৃতের অনুবাদ যেমন পণ্ডিতদিগের মতে সাধুভাষা বলিয়া গণ্য হইত, ইংরাজির কথায়-কথায় অনুবাদ তেমনি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট সাধুভাষা বলিয়া গণ্য হইল। এই অনুবাদের ফলে এমন বহু শব্দের সৃষ্টি করা হইল যাহা বাঙ্গালীর মুখেও নাই এবং সংস্কৃত অভিধানেও নাই। এবং এই সকল কষ্টকল্পিত পদই এখন বঙ্গসাহিত্যের প্রধান সম্বল। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই সকল নব শব্দ গড়িবার কোনই আবশ্যকতা ছিল। সংস্কৃত দর্শনে বিজ্ঞানে কাব্যে অলঙ্কারে যথেষ্ট শব্দ আছে যাহার সাহায্যে আমরা আমাদিগের নবশিক্ষালব্ধ সকল মনোভাব বঙ্গভাষার জাতি ও প্রকৃতি রক্ষা করিয়া অনায়াসে ব্যক্ত করিতে পারি। আমরা তথাকথিত সাধু-ভাষার বিরোধী, কেননা আমাদের বিশ্বাস, বঙ্গভাষা ব্রাত্য-সংস্কৃতও নহে, শাপভ্রষ্ট ইংরাজিও নহে। এই কারণে আমরা মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই—কারণ সে ভাষা সহজ সরল সুঠাম এবং সুস্পষ্ট।

সুতরাং আমাদের এ চেষ্টা যে মাতৃভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-মূলক এ অভিযোগের কোনরূপ বৈধ কারণ নাই। যদি কেহ বলেন যে,—মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ, সুতরাং সে পথ অনুসরণ না করা ধৃষ্টতামাত্র, তাহার উত্তরে আমরা বলিব, বঙ্গসাহিত্যের মহাজনেরা যুগভেদ এবং শিক্ষাভেদ-অনুসারে নানা বিভিন্ন পথের পথিক। দর্শনের ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রেও মার্গভেদ আছে। আমাদের

পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনেরা এই ভাষা লইয়া experiment করিয়াছেন —সুতরাং নূতন experiment করিবার অধিকার আমাদের আছে। গদ্য-সাহিত্যের বয়স এখন সবে একশ বৎসর—সুতরাং তাহার পরীক্ষার বয়স আজও পার হয় নাই। টোলের ও কলেজের বাহিরে যে ভাষা মুখে মুখে চলিতেছে, সে ভাষার অন্তরে কতটা শক্তি আছে, সে পরীক্ষা আজ পর্য্যন্ত করা হয় নাই;—আমরা সেই পরীক্ষা করিতে চাই। লোকে বলে যখন প্রাক্-বৃটীশ যুগে গদ্য ছিল না—তখন গত-শতাব্দীর গদ্যই আমাদের একমাত্র আদর্শ। আমরা নিত্য যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কই তাহারই নাম যে গদ্য এ সত্য মোলিয়েরের নাটকের নিরক্ষর ধনী বণিকের জানা ছিল না কিন্তু আমাদের আছে। সাহিত্যে সেই সনাতন আদর্শই আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

আমি ভাষাসম্বন্ধে এত কথা বলিলাম তাহার কারণ—এইরূপ সভাসমিতিতে সাহিত্যের যাহা সাধারণ সম্পত্তি তাহার আলোচনা এবং তাহার বিচার হওয়াই সঙ্গত।

(৯)

সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে ভাষার নাম কাব্য-শরীর;—কিন্তু এ শরীর ধরা-ছোঁয়ার মত পদার্থ নয় বলিয়া যাঁহারা এ পৃথিবীতে শুধু স্থূলের চর্চ্চা করেন, তাঁহাদের সাহিত্যের প্রতি চিরদিনই একটি আন্তরিক অবজ্ঞা আছে, এবং ইংরাজি শিক্ষিতসম্প্রদায়ের নিকট অর্ব্বাচীন বঙ্গসাহিত্যই বিশেষ করিয়া অবজ্ঞার সামগ্রী হইয়াছিল। এই বিরাট কুসংস্কারের সহিত সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত হইবার শক্তি ও সাহস পূর্ব্বে ছিল কেবলমাত্র দুচারিজন ক্ষণজন্মা পুরুষের।

কিন্তু সাহিত্যচর্চ্চা যে জীবনের একটি মহৎ কাজ এ ধারণা যে বাঙ্গালীর মনে আজ বদ্ধমূল হইয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই সম্মিলনী। আমাদের নব শিক্ষার প্রসাদে আমরা সকলেই জানি যে, সাহিত্য জাতীয়-জীবন-গঠনের সর্ব্বপ্রধান উপায়,—কেননা সে জীবন মানবসমাজের মনের ভিতর হইতে গড়িয়া উঠে। মানুষের মন সতেজ ও সজীব না হইলে মানবসমাজ ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারে না। যে মনের ভিতর জীবনী-শক্তি আছে তাহার স্পর্শেই অপরের মন, প্রাণলাভ করে এবং মানুষে একমাত্র শব্দের গুণেই অপরের মন স্পর্শ করিতে পারে। অতএব সাহিত্যই একমাত্র সঞ্জীবনী মন্ত্র। আমাদের সামাজিক জীবনের দৈন্য জগৎবিখ্যাত এবং সে দৈন্য দূর করিবার জন্য আমরা সকলেই ব্যগ্র। এই কারণেই শিক্ষিত লোকমাত্রেরই দৃষ্টি আজ সাহিত্যের উপর বদ্ধ। সাহিত্যই আমাদের প্রধান ভরসাস্থল বলিয়াই বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রতি আমাদের অসন্তোষও নানা আকারে প্রকাশ পাইতেছে। এ অসন্তোষের কারণ এই যে, লোকে সাহিত্যের নিকট যতটা আশা করে, প্রচলিত সাহিত্য সে আশা পূর্ণ করিতে পারিতেছে না। কাজেই নানা দিক হইতে নানা ভাবে নানা ভঙ্গীতে নানা লোকে এই শিশুসাহিত্যের উপর আক্রমণ করিতেছেন। এই সকল সমালোচনার মোটামুটি পরিচয় নেওয়াটা আবশ্যক।

(১০)

আজ আমরা সকলে মিলিয়া এ সাহিত্যের জাতিবিচার করিতে বসিয়াছি। এ নবপণ্ডিতের বিচার, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বিচার নহে। কেননা, বঙ্গ-সাহিত্য স্বজাতীয় কি বিজাতীয়,—সে বিচার

ইউরোপীয় শাস্ত্রের অধীন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ইউরোপীয় সাহিত্যের পুষ্পচয়ন করি আর না করি, ইউরোপীয় শাস্ত্রের পল্লব গ্রহণ যে করি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের নব সমালোচকেরা প্রধানতঃ দুই শাখায় বিভক্ত। একদলের অভিযোগ এই যে, বর্ত্তমান সাহিত্য জাতীয় নয়, কেননা তাহা প্রাচীন সাহিত্য নয়।—অপর দলের অভিযোগ এই যে, বর্ত্তমান সাহিত্য জাতীয় নয়, কেননা তাহা লৌকিক নহে।

শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকারমহাশয় গত দুই বৎসর ধরিয়া লোকারণ্যে এই বলিয়া রোদন করিতেছেন যে, দেশের সর্ব্বনাশ হইল, সুকুমার সাহিত্য মারা গেল। তাঁহার আক্ষেপ এই যে, তাঁহার কথায় কেহ কান দেয় না—কেননা বাঙ্গালী আজ তাঁহার মতে—"মস্তিষ্কের তীব্র চালনা গুণে পাইতেছে জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিদ্যাদর্শন পুরাবৃত্ত ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব জীবতত্ত্ব; হারাইতে বসিয়াছে—দয়ামায়া শ্রদ্ধাভক্তি, স্নেহ-মমতা, কারুণ্য-আতিথ্য আনুগত্য শিষ্যত্ব।" "আমরা কোমলপ্রাণ বাঙ্গালী, আমাদের আশঙ্কা হয়, আমরা কোমলতা হারাইয়া বুঝিবা সর্ব্বস্ব হারাইয়া ফেলি।" বাঙ্গালীর হৃদয়ের রক্ত সব যে মাথায় চড়িয়া গিয়াছে এ কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে অবশ্য বাঙ্গালীর জীবনসংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তবে মস্তিষ্কের চালনা ব্যতীত এ যুগে যে সাহিত্য রচনা করা যাইতে পারে না এ কথা নিশ্চিত। সরকারমহাশয় প্রাচীন সাহিত্যের পক্ষপাতী, কেননা তাঁহার বিশ্বাস অতি নিকট-অতীতে।

"বাঙ্গালী গ্রামে গ্রামে পালোয়ান, বাগদী, গোপ চণ্ডাল প্রহরী রাখিয়া আপনাদের বিত্তস্বত্ব রক্ষা করিত," এবং তাহার প্রধান

কাজ ছিল—"আহারান্তে খড়ের চণ্ডীমণ্ডপে খুঁটি হেলান দিয়া মুটকলমে ইতিহাস পুরাণ অবলম্বনে পুঁথি লেখা।" এভাবে অবশ্য আমরা পুঁথি লিখিতে পারি না—কেননা আমাদের বিত্ত উপার্জ্জন করিতে হয় বলিয়া আমরা আহারান্তে আপিসে যাই এবং পেন্-কলমে ইংরাজি ভাষাতে কত কি লিখি। কিন্তু সরকারমহাশয় কোথা হইতে এ সত্য সংগ্রহ করিলেন যে পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গলা আলস্যের স্বর্গ ছিল? যাঁহারা পুরাতত্ত্বের সন্ধানে ফেরেন তাঁহারা ত অদ্যাবধি এ বাঙ্গলার সাক্ষাৎলাভ করেন নাই। বোধ হয় সেই কারণেই ইতিহাস, সরকারমহাশয়ের কোমল বাঙ্গালী প্রাণে এত ব্যথা দেয়। "বাঙ্গলা সাহিত্যে যে ইতিহাসের পর দর-ইতিহাস, তাহার পর ছে-ইতিহাস দাখিল হইতেছে, আবার ইদানিং সওয়াল-জবাবও যে আরম্ভ হইয়াছে"—ইহা অক্ষয়বাবুর নিকট অর্থাৎ শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকারের নিকট একেবারেই অসহ্য। কেননা এ শ্রেণীর ইতিহাস রচনার জন্য মস্তিষ্ক চালনার প্রয়োজন আছে—অপরপক্ষে সরকার মহাশয়ের পুরাবৃত্ত কেবলমাত্র কল্পনা চালনার দ্বারাই সৃষ্ট হয় এবং তাহার গঠনে কিম্বা পঠনে বাঙ্গালীর কোমলতা হারাইবার আশঙ্কা নাই। আমি সরকারমহাশয়ের মতামত এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—কেননা নানা দিক হইতে ইহার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এ মতসম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এ সকল কথার মূল্য যে কত তাহা নির্দ্ধারণ করিতে কোনরূপ মস্তিষ্ক চালনার আবশ্যকতা নাই। বঙ্গসাহিত্য যতই শিশু হউক না কেন, এরূপ আক্রমণে মারা যাইবে না।

(১১)

অপরশ্রেণীর সমালোচকেরা আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের বিরোধী। ইঁহাদের মতে সে সাহিত্য নেহাৎ বাজে—কেননা তাহা সমাজের কোনও কাজে লাগে না। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্যকাব্যসকল যদি সরকারমহাশয়ের বর্ণিত আলস্যজাত সুকুমার সাহিত্য হয়, তাহা হইলে সে কাব্য যে সম্পূর্ণ নিরর্থক এবং সর্ব্বথা উপেক্ষণীয় সে বিষয়ে আর দ্বিমত নাই। সরকার মহাশয়ের অভিযোগ এই যে, বর্ত্তমান সাহিত্য জাতীয় চরিত্রের অবনতি ঘটাইতেছে—ইঁহাদের অভিযোগ এই যে, সে সাহিত্য জাতীয় চরিত্রের উন্নতি-সাধন করিতেছে না। এ সাহিত্য লোকশিক্ষার সহায় নয়—কেননা ইহা লৌকিক নয়, অতএব ইহা জাতীয় জীবন গঠনের উপযোগী নয়।

এ যুগের সাহিত্য যে লৌকিক নহে,—তাহা সকলেই জানেন, কেননা এ সাহিত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে-গড়া সাহিত্য। আমাদের সাহিত্য যদি এই কারণে নিরর্থক হয় তাহা হইলে তাহার এই সমালোচনা আরও বেশি নিরর্থক। শিক্ষিত লোক এবং অশিক্ষিত লোকের মনের প্রভেদ বিস্তর। এই পার্থক্য যদি দোষের হয়, তাহা হইলে এদেশে শিক্ষার পাঠ উঠাইয়া দেওয়া উচিত। শিক্ষিত লোকের রচিত সাহিত্যে শিক্ষিত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে। পৃথিবীর সকল দেশের সকল যুগের শ্রেষ্ঠ-সাহিত্য এই শ্রেণীরই সাহিত্য। শকুন্তলা, Hamlet Divina Comedia প্রভৃতি স্বল্পবুদ্ধি এবং অল্পজ্ঞানের যোগাযোগে রচিত হয় নাই। মনেরও উপর্য্যুপরি নানা লোক আছে এবং

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মানসিক ঊর্দ্ধলোকেরই বস্তু। জাতির মনকে লোক হইতে লোকান্তরে লইয়া যাওয়াই সাহিত্যের ধর্ম্ম। কামলোক হইতে রূপলোকে উঠিবার জন্য জনসাধারণের পক্ষে শিক্ষার আবশ্যক, সাধনার আবশ্যক। কবি যাহা দান করেন, তাহা গ্রহণ করিবার জন্য অপরের উপযুক্ত শক্তি থাকা আবশ্যক। মনোজগতে অমনি-পাওয়া বলিয়া কোন পদার্থ নাই,—সবই দেওয়া-নেওয়ার জিনিষ। এ যুগে এদেশে যদি এমন কাব্য রচিত হইয়া থাকে যাহা সকল দেশের শ্রেষ্ঠমনের পূজার সামগ্রী তাহা হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের যে কোনও সার্থকতা নাই—এরূপ কথার কোনও অর্থ থাকে না। বিশ্বমানবের কাছে আমাদের কাব্যসাহিত্য যে সে মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে তাহা সর্ব্বজনবিদিত। Utilitarianism-এর সাহায্যে সাহিত্যের মূল্য নির্ণয় করা যায় না। সাহিত্যের অবনতির দ্বারা জাতীয় উন্নতি সাধন করা যায় না। Faust-এর প্রথম ভাগ শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ নহে বলিয়া জর্ম্মাণ পেট্রিয়টিজম কাব্যের বিরুদ্ধে কখনও খড়্গহস্ত হয় নাই। প্রতিভাশালী লেখকেরা যে লোকশিক্ষক নহেন তাহার কারণ তাঁহারা পৃথিবীর শিক্ষকদিগের শিক্ষক।

(১২)

লোকরচিত কিম্বা লোকপ্রিয়—এ দুই অর্থেই লৌকিক সাহিত্য গান ও গল্পের সাহিত্য। সে গানের বিষয় দৈনিক জীবনের সুখ ও দুঃখ এবং সে গল্পের বিষয় দৈনিক জীবনের বহির্ভূত আশ্চর্য্যকর ঘটনাবলী। গল্প ও গুজবে মিলিয়া যে আজগুবি ব্যাপারের সৃষ্টি হয় তাহাই জনসাধারণের চিরপ্রিয়। গীতি-কবিতা

এবং রূপকথাই লোক-সাহিত্যের চিরসম্বল। এ সাহিত্য আমাদের নিকট তুচ্ছ নয়—কেননা আমরাও মানুষ এবং এইরূপ সুখদুঃখের আমরাও সমান অধীন। গল্প শুনিতে আমরাও ভালবাসি এবং রূপকথার মায়া আমরাও কাটাইতে পারি না। আমাদের রচিত উপন্যাস নবন্যাসাদিতেও যদি রূপ না থাকে তাহা হইলে তাহা কথা বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র যতই বিস্তৃত হউক—আমাদের কল্পনা তাহার সীমা লঙ্ঘন করিতে সদাই উৎসুক। আমাদের দর্শনবিজ্ঞানের কথাও কতক-অংশে স্বরূপ কথা, কতক-অংশে রূপকথা এবং এই কারণেই তাহা মানুষের শুধু মন নয়, হৃদয়ও আকর্ষণ করে। ইভলিউশনের ইতিহাসের ন্যায় বিচিত্র কথা কোনও রাজারাণীর উপাখ্যানেও নাই। আমাদের বিজ্ঞানের আলয় আমাদের নিকটেও এক-হিসাবে যাদুঘর। জনসাধারণের সহিত কৃতবিদ্য লোকের প্রভেদ এই যে, তাহাদের নিকট তাহা যাদুঘর ব্যতীত আর কিছুই নয়। বৈজ্ঞানিক কৌতূহল এবং অবৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ভিতর ব্রাহ্মণ-শূদ্র প্রভেদ। শূদ্র-সাহিত্যে দ্বিজের সম্পূর্ণ অধিকার আছে কিন্তু দ্বিজ-সাহিত্যে শূদ্রের অধিকার আংশিক মাত্র। শূদ্রের শাস্ত্রে অধিকার নাই,—অধিকার আছে শুধু পুরাণ ইতিহাসে। কারণ এ সাহিত্য গীত হয় এবং ইহা অপূর্ব্ব জল্পনা এবং অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। সাহিত্যচর্চ্চায় যে অধিকারী-ভেদ আছে তাহা অস্বীকার করায় সত্যের অপলাপ করা হয়; আধুনিক বঙ্গসাহিত্য লৌকিক না হইলেও যে লোকায়ত্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান এবং বঙ্কিমের গল্প জনসাধারণের আদরের সামগ্রী হইতে পারে কিন্তু আমাদের

আলোচনা, গবেষণা, প্রবন্ধ-নিবন্ধাদিই তাহাদের ধারণার সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

(১৩)

পূর্ব্বোক্ত সমালোচকেরা বঙ্গসাহিত্যের যথার্থ কীর্ত্তিগুলির প্রতিই বিমুখ। যদি বঙ্গসাহিত্যের গৌরব করিবার মত কোনও বস্তু থাকে তাহা হইলে তাহা বঙ্কিমের উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের নব্য ঐতিহাসিক-সম্প্রদায়ের আবিষ্কৃত বঙ্গদেশের পুরাতত্ত্ব। কিন্তু এই জাতীয় সাহিত্যই তাঁহাদের নিকট অগ্রাহ্য, কেননা তাহা জাতীয় নয়। কিন্তু যাহা, জাতীয় হউক, বিজাতীয় হউক, সাহিত্যই নয় তাহার বিরুদ্ধে তাঁহারা কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেন না। সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সাহিত্য রচনা করিবার রহস্য ও কৌশল যদি সমালোচকদিগের জানা থাকে তবে তাঁহারা স্বয়ং যে সে সাহিত্য রচনা করেন না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। কেননা বঙ্গসাহিত্যের দৈন্যই এই যে, দু-একটি প্রথম শ্রেণীর লেখক বাদ দিলে বাদবাকী তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীভুক্তও নন। ইউরোপের যে-কোন দেশের হউক বর্ত্তমান সাহিত্যের সহিত তুলনা করিলে এ সত্য সকলের নিকটই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে। এ দৈন্য ইচ্ছা করিলেই আমরা ঘুচাইতে পারি। সাহিত্যের দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণী অধিকার করিবার জন্য অসাধারণ প্রতিভা চাই না,—চাই শুধু যত্ন এবং পরিশ্রম। দণ্ডী বলিয়াছেন—

"ন বিদ্যতে যদ্যপি পূর্ব্ববাসনা
গুণানুবন্ধি প্রতিভানমদ্ভুতং।
শ্রুতেন যত্নেন চ বাগুপাসিতা
ধ্রুবং করোত্যেব কমপ্যনুগ্রহম্॥"

অর্থাৎ—

অদ্ভুত প্রতিভা এবং প্রাক্তন সংস্কারের অভাব-সত্ত্বেও আমরা যদি সযত্নে সরস্বতীর উপাসনা করি তাহা হইলে আমরা তাঁহার কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইব না।

বাঙালী জাতির হৃদয়ে রস আছে, মস্তিষ্কে বল আছে, তবে যে আমাদের সাধারণ-সাহিত্য যথোচিত রস ও শক্তি বঞ্চিত তাহার জন্য দোষী আমাদের নবশিক্ষা। আমাদের ত্রুটি কোথায় এবং কিসের জন্য, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

মানুষের সকল চিন্তার, সকল ভাবের একটি-না-একটি অবলম্বন আছে। বস্তুজ্ঞানের উপরেই সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত, সে বস্তু মনোজগতের হউক, আর বহির্জগতেরই হউক। বিদ্যালয়ে আমরা কোনও বিশেষ বস্তুর পরিচয় লাভ করি না কিন্তু অনেক নাম শিখি। আমরা ইংরাজি ভাষায়, ইংরাজি সাহিত্যে শিক্ষিত হই, অথচ ইংরাজি জীবনের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ-পরিচয়ও নাই, কাজেই সে শিক্ষার দৌলতে আমরা সঞ্চয় করি শুধু কথা। আমরা concrete-এর জ্ঞান হারাই এবং তাহার পরিবর্ত্তে পাই শুধু abstractions। ফুল বলিয়া কোনও পদার্থ জগতে নাই, আছে শুধু ভাষায়। পৃথিবীতে আছে শুধু যূথি জাতি মল্লিকা মালতী প্রভৃতি। বর্ণে গন্ধে আকারে একটি অপরটি হইতে বিশিষ্ট। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহারা আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহারা আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না। হথর্ণ লাইলাক জ্যাসমিন ভায়োলেট আমাদের নিকট নামমাত্র। এ নাম আমাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে

প্রবেশ করে না, আমাদের মনে কোনরূপ পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক করে না। কাজেই ফুলমাত্রেই আমাদের নিকট flower হইয়া উঠে। অর্থাৎ অদৃষ্ট বর্ণ এবং অননুভূত গন্ধের একটি নামাশ্রিত সমষ্টিমাত্র হইয়া দাঁড়ায়। ফলে ইংরাজি সাহিত্য হইতে আমরা অধিকাংশ স্থলে কতকগুলি জাতিবাচক, সম্বন্ধবাচক এবং ভাব-বাচক শব্দ সংগ্রহ করি; অথচ সে জাতি, সে সম্বন্ধ সে ভাব যে কাহার তাহার কোন খোঁজ নাই। কাজেই আমরা মানুষের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া মনুষ্যত্বের বিচার করিতে বসি। অথচ পৃথিবীতে মানুষ আছে কিন্তু মনুষ্যত্বনামক জাতিবাচক শব্দের পশ্চাতে কোনও পদার্থ নাই। সকল বিশেষ্যের সকল বিশেষণ বাদ দিয়াই আমরা সর্ব্বনাম লাভ করি। এই সর্ব্ব-নামেরও অবশ্য সকল ভাষাতেই স্থান আছে। কিন্তু এরূপ পদের ব্যবহারের সার্থকতা সেই স্থলেই আছে, যে স্থলে মুহূর্ত্তের মধ্যে আমরা সর্ব্বনামকে ভাঙ্গাইয়া বিশেষ্যে পরিণত করিতে পারি। যে সর্ব্বনাম নামমাত্র, তাহা কেবল অদৃষ্টার্থ ধ্বনিমাত্র। আমরা আমাদের শিক্ষালব্ধ abstraction লইয়া সাহিত্যে কারবার করি বলিয়াই আমাদের লেখায় না আছে দেহ, না আছে প্রাণ। ইউরোপীয় সাহিত্যও আমরা ত্যাগ করিতে পারিব না—আমরা স্বদলবলে ইউরোপে গিয়া উপনিবেশও স্থাপন করিতে পারিব না। তবে এ রোগের ঔষধ কি? আমার বিশ্বাস, আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ reality-র প্রতি মনোযোগ দেওয়াতে আমরা এই abstraction-এর দাসত্ব হইতে মুক্ত হইব। অনুভূতিই যে সকল জ্ঞানের মূল এই সত্যের সম্যক উপলব্ধি না হইলে আমাদের

রচিত সাহিত্য অর্থহীন শব্দাড়ম্বরসার হইতে বাধ্য। আমাদের দেশেও ফুলফল গাছপালা আছে, নরনারী ধনীদরিদ্র আছে। এই সকল বস্তুবিশেষ এবং ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞানের উপরেই যথার্থ বঙ্গসাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই কারণেই আমি সাহিত্যে প্রাদেশিকতার পক্ষপাতী। যাঁহারা চিরজীবন প্রকৃতির সহিত মুখোমুখি করিয়া বাস করেন, আশা করা যায়, তাঁহাদের রচনায় এই reality-র রূপ ফুটিয়া উঠিবে। আমি খাঁটি বাঙ্গলা ভাষার পক্ষপাতী, কারণ সে ভাষা concrete (বিশেষ সংজ্ঞক) শব্দবহুল। প্রবোধচন্দ্রিকা হইতে আমি খাঁটি বাঙ্গলার যে নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি—তাহাতে দেখিতে পাইবেন যে, প্রায় প্রতি শব্দই concrete। এই বিশেষ জ্ঞানের অভাববশতঃ আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে সংগৃহীত সামান্য ভাবগুলিও যথাযোগ্য প্রয়োগ করিতে পারি না। যে ভাব জীবনসংগ্রামে আমাদের হাতে অস্ত্র হওয়া উচিত তাহাকে হয় ত আমরা ভূষণস্বরূপে দেহে ধারণ করি। এবং যাহা ভূষণমাত্র তাহারও আমরা অযথা ব্যবহার করি। ইউরোপের পায়ের মল, গলার হারস্বরূপে বঙ্গ সরস্বতীকে কণ্ঠস্থ করিতে দেখা গিয়াছে।

পরীক্ষাব্যতীত কোন বস্তুরই সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু কোন বস্তুকেই পরীক্ষা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই। ইহাও আমাদের শিক্ষার দোষে। দিব্যাবদানে দেখিতে পাই যে, বৌদ্ধ যুগে জম্বুদ্বীপে কুলপুত্রদিগকে অষ্টবিধ বস্তু পরীক্ষা করিবার শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু এ যুগে স্কুল-কলেজে আমরাই পরীক্ষিত হই, কিছুই পরীক্ষা করিতে শিখি না। আমরা যদি বস্তু

পরীক্ষা করিতে শিখিতাম তাহা হইলে আমরা সাহিত্যে কাচকে মণি এবং মণিকে কাচ বলিতে ইতস্ততঃ করিতাম। আমাদের পক্ষে পরীক্ষা-বিদ্যা শিক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা নানা দেশের নানা যুগের নানা শাস্ত্র পড়ি এবং দেশী বিদেশী নানা মুনির নানা মতের মধ্যে কোনটি গ্রাহ্য এবং কোনটি অগ্রাহ্য তাহা স্থির করিতে পারি না। আমরা বর্ত্তমান ইউরোপ এবং প্রাচীন ভারতবর্ষ উভয়কেই সম্বোধন করিয়া বলি,—"ব্যামিশ্রেণ বাক্যেন মোহয়সি মাম।" এ অবস্থায় সকল বিষয়েরই যে দুটি দিক আছে এইমাত্র আমরা জানি কিন্তু কোনটি যে তার দক্ষিণ আর কোনটি যে বাম, সে জ্ঞান আমাদের নাই। মাসেরও যে দুটি পক্ষ আছে তাহার জ্ঞান আমরা পঞ্জিকা হইতেও সংগ্রহ করিতে পারি কিন্তু তাহার কোনটি কৃষ্ণ এবং কোনটি শুক্ল তাহা জানিবার জন্য চোখ খুলিয়া দেখা আবশ্যক।

বঙ্গ সাহিত্যের পক্ষে মহা আশার কথা এই যে, অন্ততঃ ইহার একটি শাখায় এই পরীক্ষার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির নিকট ইহার জন্য আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। সুহৃদ্বর অক্ষয় চন্দ্র মৈত্রমহাশয় এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ বরেন্দ্রমণ্ডলের ভূগর্ভে লুক্কায়িত দেবদেবীগণকে টানিয়া বাহির করিয়া তাঁহাদিগকে ইতিহাসের কাটগড়ায় খাড়া করিয়া আজ প্রশ্ন করিতেছেন, জেরা করিতেছেন। কেবলমাত্র জবানবন্দী লইয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন না, আবশ্যকমত সওয়ালজবাব করিতেও তাঁহারা প্রস্তুত। এরূপ পরীক্ষা-কার্য্যে বাঙ্গালীর কোমল প্রাণে ব্যথা দিতেও যে নব ঐতিহাসিকেরা কুণ্ঠিত নন, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমি তাঁহাদের

কৃতকার্য্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চাই। "মালদহ জেলার অন্তর্গত খালিমপুর গ্রামের উত্তরাংশে হলকর্ষণ করিতে গিয়া এক কৃষক একটি তাম্রপট্টলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে তাহাকে সিন্দূর লিপ্ত করিয়া আমরণ পূজা করিয়াছিল।" এই তাম্রশাসনখানি ঐতিহাসিকদের হাতে পড়িয়া সিন্দুরচর্চ্চিত এবং পূজিত হইতেছে না, —পরীক্ষিত হইতেছে।

বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমাদেরও ইঁহাদের প্রদর্শিত পদ্ধতিই অবলম্বন করিতে হইবে। তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ, ভূর্জ্জপত্রে লিখিত এবং বিলাতি কাগজে মুদ্রিত লিপিকে সিন্দূরলিপ্ত করিয়া পূজা করিবার যুগ চলিয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে লিপিমাত্রই, সে প্রাচীনই হউক আর অর্ব্বাচীনই হউক, বাঙ্গালীর হস্তে পরীক্ষিত হইবে। কেবলমাত্র লিপি পরীক্ষা করিয়াই আমরা নিরস্ত হইব না। ধর্ম্ম, রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, সমাজের মন, নিজের মন,—এই সকল বিষয়ই সাহিত্যের বিচারালয়ে পরীক্ষা দিতে বাধ্য হইবে। এ বিচার কেবল দর্শনে বিজ্ঞানে না, নাটকে নভেলে হইবে। কেননা বিদ্যার সহিত সম্পর্কহীন সাহিত্য সভ্যসমাজে আদৃত হইতে পারে না। সমাজের সকল জ্ঞান, সাহিত্যে কেন্দ্রীভূত এবং প্রতিফলিত হইতে বাধ্য। যে কথা বিনা পরীক্ষায় ডবলপ্রমোশন পায় সে কথা ভবিষ্যতের সাহিত্যে স্থান লাভ করিবে না। সত্যের স্পর্শ সহ্য করিবার অক্ষমতার নাম যদি কোমলতা হয় তাহা হইলে জাতীয় মন হইতে সে কোমলতা দূর করিতে হইবে। কেননা ও-কোমলতা দুর্ব্বলতারই নামান্তর এবং যুক্তি-তর্কের উপর্য্যুপরি আঘাতে সে মনকে কঠিন করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের সাহিত্যের যৌকুমার্য্য নষ্ট হইবার কোনও আশঙ্কা নাই।

ভবভূতি বলিয়াছেন—"মহাপুরুষের মন যুগপৎ বজ্রকঠিন এবং কুসুমসুকুমার।" জাতীয় মহাপুরুষত্ব লাভই সাহিত্যসাধনার ধ্রুবলক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

এই প্রসঙ্গে আমি বঙ্গসাহিত্যের আর-একটি ত্রুটির বিষয় উল্লেখ করিতে চাহি। আমাদের গদ্যের ভাষা ও ভাব দুই শিথিল-বন্ধ। আমোদের রচনায় পদ, বাক্য—কিছুই সুবিন্যস্ত নয় এবং আমাদের বক্তব্য কথাও সুসম্বদ্ধ নয়। ইহা যে শক্তিহীনতার লক্ষণ তাহা বলা বাহুল্য। যে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকলের পরস্পর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ নয়, সে দেহের শক্তিও নাই, সৌন্দর্য্যও নাই। প্রতি জীবন্ত ভাষারই একটি নিজস্ব গঠন আছে, নিজস্ব ছন্দ আছে। সেই গঠন রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের রচনা সুগঠিত হয় না; সেই ছন্দ রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের গদ্য স্বচ্ছন্দ হয় না।

ভাষার ন্যায় ভাবও রচনা করিতে হয়। আমাদের চিত্তবৃত্তি স্বতঃই বিক্ষিপ্ত;—যাহা বিক্ষিপ্ত তাহাকেই সংক্ষিপ্ত করা সাহিত্যের কাজ। মনের ভিতর যাহা অস্পষ্ট, তাহাকে স্পষ্ট করা, যাহা নিরাকার তাহাকে সাকার করাই আর্টের ধর্ম্ম।

যে সকল মনোভাব গ্রন্থিবদ্ধ নয়, তাহাদের বিশৃঙ্খল সমষ্টি সমগ্রতা নয়। চিন্তাগঠনের প্রণালীকেই আমরা লজিক বলি। লজিক এবং আর্টের সম্পর্ক যে অতি ঘনিষ্ঠ, গ্রীকসভ্যতাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেননা, আর্ট এবং লজিক এই দুই এ সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। প্রকরণভঙ্গতা সংস্কৃত সাহিত্যে মহাদোষ বলিয়া গণ্য। আমাদের গদ্য রচনা যে এ দোষে অল্প-বিস্তর দুষ্ট এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই। এ দোষ

বর্জ্জন করিবার জন্য প্রতিভার প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন আছে শুধু মনোযোগের। সাহিত্যের সাধনাও একরূপ যোগাভ্যাস। ধ্যান-ধারণা ব্যতীত এ ক্ষেত্রেও সিদ্ধিলাভ করা যায় না। ধ্যানধারণা করা, আর না করা আমাদের ইচ্ছাধীন। সুতরাং ইচ্ছা করিলেই আমরা আমাদের রচনা দৃঢ়বদ্ধ করিতে পারি।

আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালী জাতির হৃদয়-মনের ভিতর অপূর্ব্ব শক্তি আছে। যে শক্তি আজ আংশিকভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, সেই প্রচ্ছন্ন শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তিই আমাদের সকল সাধনার বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য। এই কারণেই আমি যে ভাষা ও যে ভাব, সাহিত্যে সেই শক্তির পূর্ণবিকাশের বাধাস্বরূপ মনে করি তাহার দূরীকরণের প্রস্তাব করিতে সাহসী হইয়াছি।

এ যুগে নিজের সত্যকে ধ্রুব সত্য বিশ্বাস করা কঠিন, অথচ নিজের মনে যাহা সত্য বলিয়া ধারণা তাহা প্রকাশ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। সুতরাং যাঁহারা আমার মত গ্রাহ্য করিতে অক্ষম তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন বিনা বিচারে এ মতের প্রতি সাহিত্য-রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন-দণ্ড প্রচার না করেন। আমি একটিমাত্র সত্যকে ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস করি—সে সত্য এই যে, বাঙ্গালী জাতির দেহে প্রাণ আছে। প্রাণের অস্তিত্বের প্রধান লক্ষণ বাহ্যবস্তুর স্পর্শে তাহা সাড়া দেয়। আজ একশত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর মনের সকল অঙ্গ ইউরোপীয় সভ্যতার স্পর্শে যথোচিত সাড়া দিয়াছে। এই ধ্রুবসত্যের উপরেই সাহিত্য-সম্বন্ধে আমার সকল মতামত প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

এবার

যে বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল
লয়ে দলবল
আমার প্রাঙ্গণতলে কলহাস্য ভুলে
দাড়িম্বে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে ;
নবীন পল্লবে বনে বনে
বিহ্বল করিয়াছিল নীলাম্বর রক্তিম চুম্বনে ;
সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জ্জনে ;
অনিমেষে
নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে
চাহি' সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্চ্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২০ মাঘ

পদ্মাতীর

আবার

এবারে ফাল্গুনের দিনে সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়
এই যে আমার জীবন-লতিকায়
ফুটল কেবল শিউরে-ওঠা নতুন পাতা যত
রক্তবরণ হৃদয়-ব্যথার মত ;
দখিন-হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে দিল কেবল দোল,
উঠ্‌ল কেবল মর্ম্মর-কল্লোল।
এবার শুধু গানের মৃদু গুঞ্জনে
বেলা আমার ফুরিয়ে গেল কুঞ্জবনের প্রাঙ্গণে।

আবার যেদিন আস্‌বে আমার রূপের আগুন ফাগুনদিনের কাল
দখিন-হাওয়ায় উড়িয়ে রঙীন্ পাল,
সেবারে এই সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়
যেন আমার জীবন-লতিকায়
ফোটে প্রেমের সোনার বরণ ফুল ;
হয় যেন আকুল
নবীন রবির আলোকটি তাই বনের প্রাঙ্গণে ;
আনন্দ মোর জনম নিয়ে
তালি দিয়ে তালি দিয়ে
নাচে যেন গানের গুঞ্জনে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০ মাঘ
পদ্মাতীর